SAHITYA-RATNAVALI

OR

THE GEMS OF BENGALI LITERATURE



BEING SELECTIONS IN PROSE AND VERSE FROM THE BEST PIECES OF THE BEST WRITERS IN THE BENGALI LANGUAGE FROM THE MOST ANCIENT PERIOD DOWN TO THE PRESENT TIME; WITH A FULL HISTORY OF THE RISE AND PROGRESS OF THE LANGUAGE, BIOGRAPHICAL NOTICES OF ALL THE DISTINGUISHED AUTHORS AND AN EXPOSITION OF THE NATURE AND PRINCIPLES OF BENGALI PROSODY AND RHETORIC.



(Designed for the Students preparing for the Vernacular Scholarship examinations.)

COMPILED BY

HARIMOHAN MOOKERJEA.

THIRD EDITION,—REVISED AND ENLARGED.

CALCUTTA:

THE NEW SANSKRIT PRESS.

1886.

সাহিত্য-রত্নাবলী।

ইহাতে বঙ্গভাষার অতি প্রাচীন সময় হইতে বর্ত্ত
মান কাল পর্য্যন্ত সুলেখকগণের পুস্তক হইতে
রসভাবপূর্ণ সুললিত অংশ সমস্ত উদ্ধৃত
হইয়াছে, বঙ্গভাষার আমূল ইতিহাস
ও বঙ্গীয় গ্রন্থকারবর্গের পরিচয়
এবং অলঙ্কার ও ছন্দো
সম্বন্ধীয় বিশদ প্রবন্ধ
সন্নিবিষ্ট হই
য়াছে।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিদিগের [illegible]

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

তৃতীয় সংস্করণ।
পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১৮৮৬।

সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা।

সাহিত্য-[illegible]।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গলাভাষা ও অক্ষর।

বাঙ্গলাভাষা কতদিনের এবং বঙ্গাক্ষরই বা কতদিন পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে? কোন প্রকার প্রামাণিক ইতিবৃত্তের অভাবে আমরা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ রহিয়াছি। ফলতঃ এ বিষয়ের মীমাংসা যিনি যাহাই করুন, সমুদায়ই অনুমান-সাপেক্ষ।

সংস্কৃতভাষার আনুপূর্ব্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃতভাষা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান শাব্দিক মহাশয়েরা কহেন, অতি প্রাচীনকালে মধ্য আসিয়ার ইরান প্রদেশে এক আদিম ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহারই অপভ্রংশে ইউরোপে গ্রীক্, ল্যাটিন্, জর্ম্মন, স্লাবোনীয় প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা এবং আসিয়াখণ্ডে সংস্কৃত ও জেন্দ্ ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে পারসিকদিগের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র জেন্দ্ ভাষায় লিখিত হইত, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে ঐ ভাষা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ভাষাগুলি সমধিক সাবধানতার সহিত

আলোচনা করিয়াছেন এবং পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাচীন শাব্দিকদিগের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই।

বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহা যেরূপ ভাষায় রচিত, তাহার বিশেষ বিশেষ ব্যাকরণ-নিয়ম অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রায় দৃষ্ট হয় না। ঐ ভাষার অনেক পরিবর্ত্তনের পর মনু ও বাল্মীকির রচনা প্রচারিত হয়। আবার রামায়ণের পর মহাভারতের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তৎপরে কয়েক শত বৎসর সংস্কৃতভাষার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইলে কবিকেশরী কালিদাস প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার পরেই তান্ত্রিক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃত নিতান্ত দুরুচ্চার্য্য, বিশেষতঃ তাহার স্থানে স্থানে তিন চারি ব্যঞ্জনবর্ণের একত্র সংযোগ থাকায় অধিকাংশ লোকের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইয়াছে। ঐ দুরুচ্চার্য্য শব্দসমূহের মধুরতা সাধনোদ্দেশে ভাষার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ঐ পরিবর্ত্তন প্রথমে সংযুক্ত হলবর্ণের ও মহাপ্রাণবিশিষ্ট শব্দের অল্পব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে হইতে খৃষ্টীয় শকের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময়ে গাথা ভাষার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ও গাথা ভাষায় প্রভেদ এই যে, উচ্চারণ-সৌকর্য্য ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য সংযুক্ত বর্ণ পৃথগ্‌ভূত এবং বিভক্তির লোপ বা বর্ণবিশেষ দ্বারা বিভক্তির কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ গাথা ভাষা ২৫০ বৎসর পরে অশোক রাজার সময়ে পালীনামে খ্যাত হয়।

ইহা এক্ষণে সিংহলে প্রচলিত আছে। এই ভাষায় বিভক্তি সকল অনেকাংশে সংক্ষিপ্ত, পরিবর্ত্তিত এবং স্থান বিশেষে পরিত্যক্তও হইয়াছে দৃষ্ট হয়। অশোক রাজার প্রাদুর্ভাব সময়ের ন্যূনাধিক একশত বৎসর পরে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে এক সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে প্রাকৃত, মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি কতিপয় ভাষা প্রচলিত ছিল। ঐ সকল ভাষার ক্রমপরিবর্ত্তন দ্বারা বর্ত্তমান প্রচলিত ভারতবর্ষীয় ভাষা-নিচয়ের উৎপত্তি হয়। বাঙ্গলাভাষা ঐ প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গলাভাষার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলা অক্ষরের সৃষ্টি হয় এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তন্ত্র-শাস্ত্রে বঙ্গাক্ষরের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে এরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারিত হইবার সময়ে বঙ্গাক্ষর সুতরাং বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল। দেবনাগর অক্ষর হইতেই বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত একখানি তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর না দেবনাগর, না বাঙ্গলা, অথচ উভয়েরই সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, দেবনাগর হইতে বাঙ্গলা অক্ষর উৎপন্ন হইবার সমকালেই ঐ তাম্রলিপি লিখিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে বাঙ্গলা ভাষার বয়ঃক্রম এক সহস্র বৎসরেরও কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়।

বঙ্গভাষার আদ্যকাল।

কেহ কেহ কহেন জীবগোস্বামীর করচাই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ; আবার কেহ কেহ কহেন ত্রিপুরার রাজাবলী আরও প্রাচীন। লাউসেন কৃত মনসার গান আবার অনেকের মতে বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গভাষার কোন ইতিবৃত্ত না থাকায় আমরা কিছুই নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতে পারি না। উপরি উক্ত তিনখানি গ্রন্থের যে কোনখানিই সর্ব্বপ্রাচীন হউক, তন্মধ্যে কোনখানিকেই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রাচীন রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস অনেক বাঙ্গালা পদের রচনা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সময় পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গভাষার আদ্যকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস সমসাময়িক লোক ছিলেন। উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াই এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ। তাঁহারা যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহারও কোন সন্দেহ নাই; কারণ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পদাবলী গান করিয়া সততই পুলকিত হইতেন। বিদ্যাপতির বাসস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক মত-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। বীরভূম জেলায় চণ্ডিদাসের বাস ছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ায় অনেকে

অনুমান করেন, বীরভূমের নিকটবর্ত্তী কোনস্থানেই বিদ্যাপতিরও বাস ছিল। কেহ কেহ কহেন বাঁকুড়াজেলার অন্তঃপাতী ছাত্না প্রদেশে তাঁহার বাস ছিল, তিনি ঐ প্রদেশের রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। বিদ্যাপতির রচনামধ্যে রাজা শিবসিংহ, রাণী লছিমা এবং রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ ও বৈদ্যনাথের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, শেষোক্ত তিনজন তাঁহার মিত্র ছিলেন। ১২২৯ সংবৎসরে ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে কোন ব্যক্তি লেখেন যে, "যশোহর জেলার অন্তঃপাতী ভুর্শটুর গ্রামে ১৩০৫ শকে ব্রাহ্মণজাতীয় ভবানন্দ রায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে নবদ্বীপে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম বসন্ত রায়, বিদ্যাপতি উপাধি মাত্র। তাঁহার রচিত পদাবলীর নাম বসন্তস্বকুমার কাব্য। ১৩৫৯ শকে চণ্ডিদাসের জন্ম ও ১৩৯১ শকে মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস, ইহাঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চণ্ডিদাসের রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি।" লেখকের কথা কতদূর প্রামাণ্য তাহা বলিতে পারি না।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, তথা বঙ্গদর্শনের চতুর্থখণ্ডে বিদ্যাপতি প্রবন্ধ পাঠে যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়। মিথিলায় পঞ্জীনামে এক বৃহৎ গ্রন্থ আছে, তাহাতে তত্রত্য রাজা ও ব্রাহ্মণবর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতা-

মহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য। রাজা শিবসিংহ মিথিলার অন্তঃপাতী সুগওনা গ্রামে বাস করিতেন। অদ্যাপি সেই গ্রামে তাঁহার বংশীয়েরা অতি দুস্থ অবস্থায় বাস করিতেছেন। শিবসিংহের পদ্মাবতীদেবী, লছিমাদেবী ও বিশ্বাসদেবী এই তিন মহিষী ছিলেন। শিবসিংহ ১৩৬৯ শকে সিংহাসনারোহণ করেন। বিদ্যাপতি তাঁহারই সভাসদ্ ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি দিল্লিনগরে গমনপূর্ব্বক সম্রাট সন্নিধানে কবিত্ব বিষয়ে অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিলে দিল্লীশ্বর পরমপুলকিত হইয়া শিব সিংহকে মুক্তিদান করেন এবং কবিকে বিস্পী নামক বৃহৎগ্রাম প্রদান করেন। বিদ্যাপতির বংশীয়েরা অদ্যাপি উক্তগ্রামে বাস করিতেছেন; তাঁহারা দিল্লীশ্বর প্রদত্ত দানপত্র অদ্যাপি দেখাইয়া থাকেন। এতৎ প্রমাণে অনুমিত হইতেছে যে মিথিলায় বিদ্যাপতির বাস ছিল।

চণ্ডিদাসের রচনামধ্যে তাঁহার বাসস্থানের পরিচয় ভিন্ন অপর কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। নান্নুরগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। ঐ গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী সাকুল্লিপুর থানার অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ঐ গ্রামে বাশুলী (বিশালাক্ষী) নামে এক শিলাময়ী দেবী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। জনপ্রবাদ এই যে, চণ্ডিদাস প্রথমে ইহাঁর উপাসনা করিতেন, পরে ইহাঁরই আদেশে কৃষ্ণপরায়ণ হন। নিম্নে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের রচনা হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"সুজনকো প্রেম হেম সমতুল। দাহিতে কণক দ্বিগুণ হয় মূল॥ টুটাইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্‌ভুত। যৈছন বাঢ়ত মৃণালকো সুত॥ সবহু মতঙ্গ যেমতি নাহি মানি। সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণি॥ সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত। সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥" বিদ্যাপতি।

"কবরী ভয়ে, চামর গিরিকন্দরে, মুখভয়ে চান্দ আকাশ। হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতি ভয়ে গজ বনবাস॥" বিদ্যাপতি।

"নন্দের নন্দন চতুর কান। মিলিল আসিয়া হৃদয়জান॥ যাহার যেমত পীরিতি গাঢ়া। তাহার তেমতি করিল বাঢ়া॥ মথুরা হইতে এখনি হরি। আইল বলিয়া শবদ করি॥ আপন ঘরে আপনি গেলা। পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥ কোলেতে করিয়া নয়নজলে। সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥ আর দূরদেশে না যাবে তুমি। বাহির আর না করিব আমি। এত বলি কত দেওল চুম্ব। বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥ ঐছন মিলল সকল সুখা। আর কত জন কে করু লেখা॥" চণ্ডিদাস।

বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সমূহের মধ্যে গোবিন্দদাস নামে এক জন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। বান্ধবের দ্বিতীয় খণ্ডে গোবিন্দদাস প্রবন্ধ পাঠে নয়জন গোবিন্দ-দাসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে ছয়জন পদাবলী রচয়িতা। সেই ছয়জনের মধ্যে একজনকে আমরা চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া স্বীকার করিতেছি। বিদ্যাপতির অনেক কবিতায় গোবিন্দ-দাসের নামোল্লেখ আছে। কেহ কেহ কহেন যে

গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন, আবার কেহ কেহ এরূপও কহিয়া থাকেন যে, তিনি চৈতন্যদেবের সময়ে অথবা কিছু পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া বিদ্যাপতির অর্দ্ধসমাপিত শ্লোকগুলি সংপূরণ করত বিদ্যাপতি ও নিজ নামে ভণিতি দিয়া গিয়াছেন। আমরা এ মতের পোষকতা করিতে পারি না। উইলসন সাহেব কহেন, চণ্ডিদাস ও গোবিন্দ-দাস উভয়ে মিলিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনেকে কহেন গোবিন্দদাস কৃষ্ণকর্ণা-মৃত গ্রন্থের প্রণেতা। ঐ গ্রন্থও চৈতন্যের অতি প্রিয়-বস্তু ছিল। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে;—"চণ্ডিদাস বিদ্যা-পতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥" ইহাতে কে গোবিন্দদাসকে চৈতন্য-দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক না বলিবেন? ইহাঁর প্রকৃত নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, পিতার নাম গোপাল চক্রবর্ত্তী। কাটোয়ার উত্তরস্থিত ঝামটপুরগ্রামের নিকটবর্ত্তী বন-পাড়া নামক অতি ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামে ইহাঁর বাস ছিল। নিম্নে গোবিন্দ দাসের কবিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

"নবনীরদ তনু, তড়িত লতাজনু, পীতপতনি বনিভাল। মালতী বকুল, বলিত অলি আকুল, মৌলি মিলিত বনমাল॥ পেখলু কালিন্দী কুল বিলাসী। হেলি কল্পতরু, তরুণী-মোহ , বাওরে বিনোদিয়া বাঁশী॥"

চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব সময়ের পূর্ব্বে আমরা আর

কোন কবিবর পরিচয় পাই নাই। সুতরাং এই সময়েই আদ্যকালের পরিসমাপ্তি হয় স্বীকার করিতে হইবে।

বঙ্গভাষার মধ্যকাল।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে আবির্ভূত হইয়া ১৪৫৫ শকে অন্তর্হত হন। তাঁহার সময় হইতেই বঙ্গভাষার যুগান্তর উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যসমূহের মধ্যে অনেকেই পদাবলীর রচনা দ্বারা কবিত্বের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারাই বঙ্গভাষাকে উন্নতিশালিনী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যদি অজ্ঞলোকদিগের উপকার-বিধানের জন্য লেখনী ধারণ না করিতেন, তবে আমরা এক্ষণে বঙ্গভাষাকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ।

চৈতন্যদেবের প্রিয়শিষ্য মধ্যে অনেকগুলি গোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা নয়জন গোবিন্দের নাম পাইয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম গোবিন্দের পরিচয় আদ্যকালে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় গোবিন্দদাস নবদ্বীপ নিবাসী গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী; ইনি গৌরাঙ্গের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিতেন। ইনি কবি ও সুগায়ক ছিলেন। ইহাঁর অধিকাংশ পদই চৈতন্য-বিষয়ক। গোবিন্দানন্দের পদ-রচনার পরিচয়, যথা;—

'পুলকে পূরল তনু নিজগুণ শুনি। প্রেমে অঙ্গ গর গর

লোটায় ধরণী॥ ক্ষণে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। গদাধর-মুখ হেরি পড়ে মূরছিয়া॥ ক্ষণে মালসাট মারে ক্ষণে বলে হরি। রাধ রাধা বলে কাঁদে ফুকারি ফুকারি॥"

তৃতীয় গোবিন্দদাস কায়স্থকুলসম্ভূত গিরীশ্বর দত্তের পুত্র। ইহাঁর বাসস্থানের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ ইহাঁকে চট্টগ্রাম-নিবাসী বলিয়া অনুমান করেন। ইনি বিখ্যাত কীর্ত্তনগায়ক এবং চৈতন্য-দেবের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর রচনায় অনুপ্রাস-বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;—

"গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল। গায়ত গমক, গীতকীরি গুর্জ্জরী, গৌরী গোল গান্ধার। গোপী গোপ, গরিমাগুণ গোপক, গোকুল গাম বিহারী। গুঞ্জা গৈরিক, গোরস গরভিত, গোরোচনা রুচিরধারী॥"

চতুর্থ গোবিন্দদাসের প্রকৃত নাম গোবিন্দ আচার্য্য, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র, নিবাস মালিহাটী। ইনিও চৈতন্যের একজন প্রিয়শিষ্য। ইহাঁর রচনার পরিচয়, যথা ;—

"নাচে নিত্যানন্দ, ভুবন-আনন্দ, বৃন্দাবন-গুণ শুনিবারে। বাহুযুগ তুলি, বলে হরি হরি, চলন মন্থর ভাতিয়ারে॥ কিবা সে মাধুরী, বচনচাতুরী, গদাধর-মুখ হেরিয়া রে। মাধব গোবিন্দ, শ্রীবাস মুকুন্দ, গাওত ও রস ভরিয়ারে॥"

পঞ্চম গোবিন্দদাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী যোগ্রাম কুলীনগ্রাম নিবাসী গোবিন্দ ঘোষ। চৈতন্যদেবের যে সাতটী কীর্ত্তনের দল ছিল, তন্মধ্যে ইনি এক দলের প্রধান ছিলেন। ইহাঁর রচিত পদাবলী যারপরনাই প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট। যথা ;—

"প্রাণের মুকুন্দ হে আজি কি শুনিনু আচম্বিত। কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়, গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ॥ ইহা তো না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা, অবনত মাথে আছি বসি। নিঝরে নয়ন ঝরে, বুক বহি ধারা পড়ে, মলিন হৈয়াছে মুখশশী॥ দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আনচান, সুধাইতে নাহি অবসর। ক্ষণেকে সম্বিত হৈল, তবে মুঞি নিবেদিল, শুনিয়া দিলেন এ উত্তর॥ আমিত বিবশ হৈয়া, তারে কিছু না কহিয়া, ধাইঞা আইনু তব পাশ। এইত কহিনু আমি, যা করিতে পার তুমি, মোর নাহি জীবনের আশ॥"

আর তিনজন গোবিন্দদাস চৈতন্যের প্রিয়শিষ্য ছিলেন, কিন্তু কবিত্ববিষয়ে তাঁহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। একজনের নাম গোবিন্দ গরুড় মহাবীর, একজনের নাম মাত্র গোবিন্দ, আর এক গোবিন্দ চৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরী কর্ত্তৃক চৈতন্যসমীপে প্রেরিত।

জীবগোস্বামী চৈতন্যের সমসাময়িক লোক, এবং তাহার রচনা সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের তিরোভাব সময়েই প্রচারিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ জীবগোস্বামীকে রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ভক্তমাল-গ্রন্থকার কহেন, "জীব মানকর নিবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। রূপ ও সনাতন জাতিতে মুসলমান ছিলেন, উভয়েই গৌড়ের বাদসাহ হুসেন সাহার মন্ত্রিত্ব করিতেন। ঐ ভ্রাতৃদ্বয় চৈতন্যসমীপে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রূপ ও সনাতন নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করেন।"

জীবগোস্বামীর পরিচয় সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতকার যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য। জীব রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। রূপ ও সনাতন যে মুসলমান জাতীয় ছিলেন, ইহা কোন্ কবির কল্পনা তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। জীবগোস্বামী স্বকৃত বৈষ্ণব-তোষিণী গ্রন্থের শেষে যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সনাতন, রূপ ও জীব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। শ্রীযুক্ত রামদাস সেন-প্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথম ভাগে "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ" প্রবন্ধে, বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থের জীব-পরিচয় যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমরা নিম্নে অবিকল প্রকটন করিলাম।

"ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদস্বরূপ মধুকরী, যাহার অমৃত-নিঃস্যন্দিনী জিহ্বাস্বরূপ কল্পলতিকাতে বিশিষ্ট মনোজ্ঞ পদ ক্রমাদি আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়াছিল রাজসভায় সভ্যেরা সর্ব্বদা যে মহাত্মার পদসেবা করিত, সেই ভরদ্বাজ-কুলপ্রবর কর্ণাটরাজ, যিনি এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ যশোবিষয়ে শশধর-স্পর্দ্ধী, প্রভাবে ইন্দ্রের তুল্য, ভূপালবর্গের পূজ্য, সমগ্র যজুর্ব্বেদের বিশ্রাম ভূমিস্বরূপ, এবং লক্ষ্মীর আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। ঐ সুবিখ্যাত রাজার দুই মহিষী ছিলেন। রাজপত্নীদ্বয় অনিরুদ্ধ হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার একের নাম শ্রীরূপেশ্বর, অপরের নাম হরিহর। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শাস্ত্রবিদ্যায় এবং কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ

পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ তৎকালে বৃন্দাবনে গমন করেন, স্বরাজ্যকে বিভাগ করিয়া রূপেশ্বর ও হরিহরকে প্রদান করিয়া যান। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ হরিহর স্বজ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এখন রূপেশ্বর শত্রুকর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আটটী অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নীসমভিব্যাহারে পৌরস্ত্যদেশ প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বর তাঁহার সখা ছিলেন, রূপেশ্বর এক্ষণে তাঁহারই আবাসে সুখে বাস করিতে লাগলেন। ক্রমে তথায় বাস করিতে করিতে তাঁহার একটী পুত্র হইল। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখিলেন। গুণনিধান ও শক্তিমান্ পদ্মনাভের রসনায় সাঙ্গ শুক্লযজুর্ব্বেদ ও সবিস্তর উপনিষদ্ সকল তাণ্ডবিত হইয়াছিল। এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণহৃদয় হইয়াছিলেন, এইরূপ সকল মনুষ্যের কর্ণপথে প্রেরিত হইল। এক্ষণে, শিখরেশ্বরের অধিকারে বাস করিতে পদ্মনাভের অস্পৃহা জন্মিল, গঙ্গাতটে বাস করিবার জন্য সমুৎসুকচিত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি নবহট্ট নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় বাস করিয়া যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ চতুর্থ মুরারি, পঞ্চম মুকুন্দ। মহাত্মা মুকুন্দের এক পুত্র, তাঁহার নাম কুমার। এই শ্রীমান্ কুমার শত্রুকর্তৃক অপকৃত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কুমারের অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। ঐ মহাত্মার বংশপরম্পরা সর্ব্বত্র পূজ্য।

দ্বিজবর কুমারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ বল্লভ। এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় সামান্য রাজ্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভ, তিনিই আমার পিতা। আমার পিতা গঙ্গাসলিলে সঙ্গত হইয়া শ্রীরামপদ প্রাপ্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদ্বয় বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন।'' ইহা পাঠ করিয়া যদি কেহ সনাতন ও শ্রীরূপকে মুসলমান এবং জীবকে মানকর-নিবাসী দরিদ্র -ব্রাহ্মণতনয় বলিতে চাহেন, বলুন, কিন্তু আমরা কোন মতেই সে বাক্যের অনুমোদন করিতে পারি না।

জীবগোস্বামী বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক পরমবৈষ্ণব হইলেন। রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, কর্ণপূর প্রভৃতি চৈতন্যশিষ্যদিগের অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ইহার পরেই নবদ্বীপ-নিবাসী বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থের রচনা করেন। ইনি চৈতন্যের জীবিতকালে জন্মগ্রহণ করিয়া চৈতন্য-তিরোধানের প্রায় বিংশতিবৎসর পরে গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনবৃত্ত বর্ণিত আছে। চৈতন্যভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৃন্দাবনদাসের সময়ে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর গান প্রচলিত ছিল, কিন্তু কোন্ সময়ে ঐ গীত রচিত হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বৃন্দাবনদাসের রচনা হইতে নিম্নে কতিপয় পংক্তি প্রদত্ত হইল ;—

"প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে

পৃথিবীতে। নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে॥ না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া। পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া॥ কমলনয়ন তোমার শ্রীচন্দ্রবদন। অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥ অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন। কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্রগমন॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥ পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥ ধর্ম্ম বুঝাতে বাপ তোর অবতার। জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥ তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥ প্রেমশোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমেতে রোধিত-কণ্ঠ না করে উত্তর॥"

বৃন্দাবনদাস-বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল প্রচারের কিছু কাল পরেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের রচনা করেন। কাটোয়ার সন্নিহিত ঝামটপুরে বৈদ্যকুলে কৃষ্ণদাসের জন্ম। কৃষ্ণদাসের রচনার পরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল;—

"মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্তমাত্র। রূপসনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র॥ কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন। তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥ কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপসনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥ কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংসিয়ে কহে সেই ভক্তগণ॥ অনিকেতন রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥ করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥"

সম্ভবতঃ এই সময়ে রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া অনেক পদাবলীর রচনা করিয়া যান। চৈতন্যদেবের জন্মের ৮২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৮৯ শকে রাজসাহীজেলার অন্তঃপাতী বুধরী গ্রামে বৈদ্যজাতীয় পরমানন্দ গুপ্তের ঔরসে এক গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ কহেন, মুরশিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী শাদিখার দেয়ারে গোবিন্দ কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বিরচিত গ্রন্থের নাম পদমালা। ইনি অসংখ্য পদাবলী রচনা করিয়া যান। ইঁহার রচনার পরিচয় যথা,—

'ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দরে। মনুষ্য দুর্লভদেহ, সৎসঙ্গে, সেবহ, হরিপদ নিকরে॥ শীত আতপ, বাত, বরিখন, এদিন যামিনী জাগিরে। বৃথায় সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগিরে॥ শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পাদসেবন দাসী রে। পূজন সখীগণ, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥"

এই সকল পদাবলী পাঠে প্রতীতি হয়, বঙ্গদেশে প্রথমতঃ এক প্রকার হিন্দিভাষা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত ও হিন্দিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ হিন্দি ভাষাও মাগধীর অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ফাহিয়ান নামক জনৈক চীনদেশীয় পরিব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ষোড়শশত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে সংস্কৃত ও মাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে বঙ্গভাষার রচনাপ্রণালী কোন প্রকার নিয়ম নিবদ্ধ ছিল না। কি পয়ার, কি ত্রিপদী, কি ছন্দ-

তেই মাত্রা, অক্ষর এবং মিত্রাক্ষরের সমতা দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন পদাবলী-লেখকেরা সে সকলের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতেন। ইহার অনেক কাল পরে ব্যাকরণের নিয়ম ও পদ্য-রচনার রীতি প্রচলিত হয়। সকল ভাষার আদি রচনা সম্বন্ধেই এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক বাঙ্গলাগ্রন্থ সমূহের অব্যবহিত পর হইতেই ক্রমান্বয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডী, ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসের মনসার ভাসান, কাশী-রামের মহাভারত, প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল, রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন, রামপ্রসাদ সেনের কবিরঞ্জন, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্ত এই গ্রন্থমধ্যে বিনিবেশিত হইয়াছে বলিয়া এস্থানে আর বিস্তার করিলাম না।

রামায়ণ ও চণ্ডী প্রচারের কিছুকাল পরেই কায়স্থ জাতীয় ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস উভয়ের প্রণীত মনসার ভাসান প্রচারিত হয়। বর্ণনা দৃষ্টে, বর্দ্ধমান জেলারই কোন স্থানে তাঁহাদিগের বাস ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইঁহারা কেহই সুকবি ছিলেন না, তবে ইঁহাদিগের রচিত পুস্তকে ধর্ম্মসংস্রব থাকায় অদ্য পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

কোন্ সময়ে প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী প্রাদুর্ভূত হইয়া কালিকামঙ্গলের রচনা করেন এবং তাঁহার সেই গ্রন্থই বা কি প্রকার, এ সকল বিষয়ের কোন নিদর্শনই পাওয়া

যায় না। আমরা বহু অনুসন্ধানেও কালিকামঙ্গল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী বরদা পরগণার মধ্যে যিদু-পুর গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে শিবসংকীর্ত্তন-প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কর্ণগড়ের পূর্ব্বা-ধিকারী যশোবন্তসিংহের সভাসদ হইয়া অযোধ্যাকাড় গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ঐ রাজসভাতে রামেশ্বর ১৬০৪ শকে শিবসংকীর্ত্তন গ্রন্থের প্রচার করেন। রামেশ্বর সুকবি ছিলেন এবং তাঁহার বিলক্ষণ কল্পনাশক্তিও ছিল। শিবসংকীর্ত্তন পাঠ করিলে গ্রন্থকারকে সুচতুর, পরিহাসরসিক ও সুকবি বলিয়া প্রতীতি হইবে।

অন্নদামঙ্গল প্রচারিত হইবার কিছুকাল পরে জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী উলাগ্রামনিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী গ্রন্থের রচনা করেন। ইনি তাদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না, তবে গ্রন্থবর্ণিত বিষয় ধর্ম্মসংস্রবাপন্ন হওয়ায় প্রাচীন সমাজে উহার সমা-দর আছে।

মধ্যকালে কোন্ সময়ে ঘনরাম ধর্ম্মের গান এবং শিবরাম সত্যনারায়ণের গানের রচনা করেন, তাহা নিরূ-পণ করা অত্যন্ত কঠিন। এপর্য্যন্ত আমরা কোন গদ্যগ্রন্থের পরিচয় পাই নাই।

বঙ্গভাষার ইদানীন্তন কাল।

ইদানীন্তন কালের প্রথমেই কতকগুলি গীতরচকের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে রামনিধি গুপ্ত সর্ব্বপ্রধান। ইনিই নিধুবাবু বলিয়া এতদ্দেশে বিখ্যাত। ইনি ১১৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৪৫ সালে ৯৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। পাণ্ডুয়ার নিকট চাঁপতা গ্রামে ইহাঁর পৈত্রিক বাস ছিল, কিন্তু ইনি কলিকাতার অন্তর্গত কুমারটুলিতে বাস করিয়াছিলেন। আদিরসঘটিত গীত রচনায় নিধুবাবুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল।

এই সময় হইতেই কবির গানের সৃষ্টি হয়। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরুঠাকুর, রামবসু, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। হরুঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী। ইনি কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়া পল্লীতে ১৬৬১ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৩৬ শকে লীলাসংবরণ করেন। ইনি সখীসংবাদ গীতরচনায় অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। রাম বসু শালিকাগ্রামে ১৭০৯ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৫১ শকে সংসার ত্যাগ করেন। ইনি বিরহবর্ণনায় কবিওয়ালাদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইহাঁদিগের পরেই পরাণদাস, উদয়চাঁদ, নীলু-পাটুনী, রামপ্রসাদ, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, আণ্টুনী সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন কবিওয়ালা বর্ত্তমান ছিলেন। এখন আর কবির সে প্রকার আদর নাই।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী চুপিগ্রামে রঘুনাথ রায়

বাস করিতেন। বর্দ্ধমানের রাজসংসারে দেওয়ান ছিলেন বলিয়া "দেওয়ান মহাশয়" নামে তিনি সাধারণ্যে পরিচিত। শক্তিভক্তিবিষয়ক গীতরচনায় তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। উক্ত প্রদেশের অন্তঃপাতী পীলাগ্রামনিবাসী দাশরথি রায় গীতরচনায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। দাশুরায়ের পাঁচালী দেশবিখ্যাত। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী উলসী সামটা নিবাসী মধুসূদন কাইন একজন প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতা ছিলেন। এক্ষণে অনেক যাত্রার দলেই সুন্দর সুন্দর গীত রচিত হইতেছে। এ সকলের দ্বারা বঙ্গভাষার অনেক পুষ্টিসাধন হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ইংরাজদিগের দ্বারাও বঙ্গভাষার সামান্য উপকার হয় নাই। যখন ইংরাজেরা এদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে হাল্‌হেড সাহেব একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি প্রথমে বঙ্গভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ১৭৭৮ খৃঃঅব্দে একখান বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ইহাই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ। তৎকালে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। উইল্‌কিন্স্ সাহেব সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে এদেশের বিবিধ ভাষা শিক্ষা করেন এবং শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা থাকায় স্বহস্তে খুদিয়া এদেশীয় অক্ষর সকল প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে হাল্‌হেড সাহেবের ব্যাকরণ হুগলিতে মুদ্রিত হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে যে সকল ব্যবস্থা ইংরাজী

ভাষায় প্রণয়ন করেন, করষ্টর সাহেব সেই সকলের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের উপকার করিয়া যান। ইনিই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে মার্সমান, ওয়ার্ড, কেরি প্রভৃতি পাদরী সাহেবেরা শ্রীরামপুরে অবস্থান পূর্ব্বক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন এবং এদেশীয় বিবিধ ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত সেই সময়ে তাঁহাদের যত্নে মুদ্রিত হয়। ঐ সকল সাহেবেরা কতকগুলি বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তাহারও পাঠ্যপুস্তক সকল প্রণয়ন পূর্ব্বক মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ সংস্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বাঙ্গলা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। কেরি সাহেব ঐ সময়ে বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান প্রচারিত করেন। মার্সমান সাহেবও একখানি ছোট অভিধান প্রকাশিত করেন। বঙ্গীয় আদিকবি বিদ্যাপতি প্রণীত সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা ফোর্টউইলিয়ম কালেজের অন্যতর পণ্ডিত হরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক ১৮১৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয়। তাহার পর ঐ বিদ্যালয়ের জন্য রাম রাম বসু কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য-চরিত ও উৎকলনিবাসী পণ্ডিতবর মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে প্রবোধচন্দ্রিকা প্রচারিত হয়। এ তিন খানিই গদ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থত্রয়ের ভাষা নিতান্ত বিশৃঙ্খল।

কোন স্থানে সুদীর্ঘ সমাসের আড়ম্বর, কোন স্থানে বা অপ্রসিদ্ধ আভিধানিক শব্দ, আবার কোথাও বা অপভ্রংশ শব্দ বিন্যাস প্রভৃতি দোষে দূষিত।

ইহার পরেই রাজা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতি পক্ষে বিশিষ্টরূপে চেষ্টা করেন।

কলিকাতা-নিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রাধামোহন সেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি সঙ্গীত-তরঙ্গ নামে পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচনাশক্তির উপযোগিনী কবিত্বশক্তি ছিল না।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্ম পরিগ্রহ করেন। মদনমোহন কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে পাঠ করিয়া কৃত-বিদ্য ও যশস্বী হন। পাঠদশাতেই একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা গ্রন্থের রচনা করেন। রসতরঙ্গিণী কতকগুলি সংস্কৃত আদিরস-ঘটিত শ্লোকের অনুবাদ এবং বাসবদত্তা সুবন্ধু-কৃত সংস্কৃত বাসবদত্তার অনুবাদ। উভয় পুস্তকই কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয়স্থল হইলেও অশ্লীলতা-দোষে নিতান্ত দূষিত। তিনি ক্রমান্বয়ে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালা, বারাসত বিদ্যালয়, ফোর্ট-উইলিয়ম কালেজ ও কৃষ্ণনগর কালেজে অধ্যাপকতা করিয়া শেষে সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক হন। মহামতি বিটন্ সাহেব এই সময়ে কলিকাতায় যে বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার প্রধান উত্তরসাধক। তিনি তথায় অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন। এই সময়ে বালক বালিকাদিগের পাঠের

জন্য তাঁহার দ্বারা তিন ভাগ শিশুশিক্ষা প্রচারিত হয়। অদ্যাপি ঐ তিনখানি পুস্তক অতি সমাদরে শিশুসমাজে পঠিত হইয়া থাকে। ইহার পরে বহরমপুরে জজ-পণ্ডিত হইয়া যান। কিছুদিন ঐ পদে থাকিয়া কান্দী মহকুমার ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত হন। ঐ স্থানেই ১২৬৪ সালে ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮০৯ খৃঃ অব্দে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যকুলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই। প্রকৃতিদত্ত কবিত্ব-শক্তি বিদ্যাবত্তার অপেক্ষা রাখে না। ১৮৩০ খৃঃ অব্দ হইতে তাঁহার "সংবাদ প্রভাকর" নামক সংবাদপত্র বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এতদ্ভিন্ন সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন নামে আরও দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রও তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইত। এই সময়ে তিনি ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া মাসিক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। তিনি হাপ-আকড়াই ও সকের পাঁচালীর দলে কখন কখন ছড়া ও গান বাঁধিতেন। হাস্যরসোদ্দীপক কাব্যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি শেষাবস্থায় প্রবোধপ্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ ও কলিনাটক, এই চারিখানি পুস্তকের রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইল নবদ্বীপাধিপতি রাজা

গিরিশচন্দ্র রায়ের সভায়, কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী একজন সভাসদ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুরসিক উপস্থিত-বক্তা ছিলেন; তজ্জন্য মহারাজ তাঁহাকে "রসসাগর" উপাধি প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত পাদ-পূরণ-সংকল্পে কত যে কবিতা রচনা করিয়া যান তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে।

১৭৩৯ শকে, কলিকাতা নিবাসী মৃত বাবু আশুতোষ দেবের অনুমত্যনুসারে, মূলাযোড় নিবাসী বঙ্গচন্দ্রবন্দ্যো-পাধ্যায়, অন্নদামঙ্গলের অনুকরণে দুর্গামঙ্গল গ্রন্থের রচনা করেন। কবিত্বের সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল ইহাতে অত্যন্ত বিরল।

প্রায় ত্রিংশৎ বর্ষ অতীত হইল একদেশে রঘুনন্দন গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তিনি রাম-রসায়ন কাব্যের রচনা করেন। উহাতে রামায়ণের সপ্তকাণ্ড সন্নিবেশিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের তাদৃশ রচনা শক্তি না থাকিলেও তিনি কবিত্বশূন্য ছিলেন না।

বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মৃত রেবরেণ্ড ডাক্তার * কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন লেখকের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাকল্পদ্রুম এবং রাজেন্দ্রলালের সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বিবিধ উপায়ে মাতৃভূমির ও মাতৃ-

---

* ধর্ম্ম, ব্যবহার, চিকিৎসা, সঙ্গীত ও দর্শন ইহার যে কোন বিষয়ে যদি কেহ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন তবে তিনি ডাক্তার এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। ডাক্তার বলিলে যে শুদ্ধ চিকিৎসকই বুঝাইবে এমন নহে।

ভাষার বহুবিধ উৎকর্ষ বিধান করিয়া অতি প্রাচীন বয়সে গত ১২৯২ সালে লোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার একাল ও সেকাল গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যসমাজে উপাদেয় বস্তু বলিয়া প্রথিত।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ত্তমান লেখক-শ্রেণীর শিরোভূষণ। হুগলি জেলার অন্তঃপাতী খানাকুলের সন্নিহিত বীরসিংহ গ্রামে, ১৭৪২ শকে ১২ই আশ্বিন দিবসে তাঁহার জন্ম হয়, পিতার নাম ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বতন্ত্র পুস্তক না লিখিলে আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমস্ত গুণ-গ্রামের কথা বিশদরূপে প্রকাশ করা যায় না। বঙ্গভাষা বিদ্যাসাগরের নিকট কি পরিমাণে ঋণী তাহা লিখিয়া শেষ করা কঠিন।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী চুপী গ্রামে, কায়স্থকুলে, ১৭৪২ শকে, শ্রাবণমাসে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত জন্ম-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺পীতাম্বর দত্ত। অক্ষয়কুমার বাঙ্গলা ভাষাকে অনেক উৎকৃষ্ট ভূষণ প্রদান করিয়াছেন।

১৭৪৪ শকে কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি গ্রামে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺রামধন শিরোমণি। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি নাটকের রচনা করায় তিনি "নাটুকে রামনারায়ণ" বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছেন। তিনি পঠদ্দশায় পতিব্রতো-পাখ্যানের রচনা করেন।

১৭৪২ শকে চাংড়িপোঁতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। পিতার নাম ৺হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। নীতিসার, ভূষণসার ব্যাকরণ, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত। তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশ দেশ বিখ্যাত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসার ৺নীলমণি বসাক কর্ত্তৃক বিবিধ-প্রকারে উপকৃত হইয়াছে। তিনি পারস্য উপন্যাস, আরব্য উপন্যাস, বত্রিশসিংহাসন, নবনারী ও তিনভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রচারিত করিয়াছেন।

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নীতিবোধ ও টেলিমেকস গ্রন্থের দ্বারা সাহিত্যসমাজে পরিচিত।

কলিকাতা হরিতকীবাগান পল্লীতে ১৭৪৭ শকে শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতা বিখ্যাতনামা ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ইনি শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ক্ষেত্রতত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা করেন।

১৭৫০ শকে যশোহরের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে কায়স্থকুলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রাজনারায়ণ দত্ত। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মধুসূদন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত কবিতামালা প্রদান করিয়া ইনি অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইনি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, একেই কি

বঙ্গে সভ্যতা প্রহসন, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, হেক্টরবধ কাব্য ও মায়াকানন নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা করিয়া কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় সমাজে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া পরিচিত।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাল্‌নার নিকট বাকুলিয়া গ্রামে ১৭৪৮ শকে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল এক্ষণে খিদিরপুরে বাস করিয়াছেন। পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, শূরসুন্দরী, কাঞ্চীকাবেরী প্রভৃতি কাব্যে তাঁহার কবিত্বের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ইলছোবা মোল্লাই গ্রামে শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺হলধর চূড়ামণি। ইঁহার দ্বারা বঙ্গভাষার অনেক উপকার হইয়াছে। ইনি ক্রমান্বয়ে অন্ধকূপহত্যা, বস্তুবিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ, রোমাবতী, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, শিশুপাঠ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, কুপিতকৌশিক নাটক, গোষ্ঠীকথা এবং বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানির নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলে গ্রন্থকারের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। এই গ্রন্থখানি সমগ্র পাঠ করিলে বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান জন্মে।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কাঁচকুলী গ্রামে ৺তারাশঙ্কর

তর্করত্ন জন্মপরিগ্রহ করিয়া কাদম্বরী ও রাসেলাসের অনুবাদ এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা করেন।

কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন বাঙ্গলা পদ্যে শকুন্তলা ও তুলসীর রামায়ণের কিয়দংশ প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচনা নিতান্ত কবিত্ব-শূন্য নহে।

নদীয়া জেলার রাজধানী কৃষ্ণনগরে ১৭৪৭ শকে ৺লোহারাম শিরোরত্ন জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ গোলকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। মালতীমাধব, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, শিশুবোধ ব্যাকরণ, নীতিপুষ্পাঞ্জলি ও মুগ্ধবোধসার এই কয়খানি গ্রন্থের রচনা করিয়া শিরোরত্ন মহাশয় দেশমধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী চৌবেড়ে গ্রামে ৺দীনবন্ধু মিত্র ১৭৫১ শকে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺কালাচাঁদ মিত্র। নীলদর্পণ, নবীনতপস্বিনী, লীলাবতী, কমলে কামিনী, বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো, সধবার একাদশী, জামাই-বারিক, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীনবন্ধু বঙ্গদেশে কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত পরিহাসরসিক কবি ছিলেন। তৎকৃত জামাই ষষ্ঠী, যমালয়ের জীয়ন্ত মানুষ ইত্যাদি অনেক হাস্যরসোদ্দীপক প্রবন্ধ বর্ত্তমান আছে।

কলিকাতানিবাসী ৺প্যারীচাঁদ মিত্র ৺টেকচাঁদ ঠাকুর এই আরোপিত নাম পরিগ্রহ করিয়া নূতন রচনা-প্রণালী অবলম্বন করত আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন গ্রন্থেই সেরূপ রচনাকৌশল দৃষ্ট হয় নাই। টেকচাঁদী

তাহাকে আমরা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কথোপকথনে সর্ব্বদা যে ভাষার ব্যবহার, টেকচাঁদী ভাষা তদপেক্ষা কোন অংশে উন্নত নহে। আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, রামরঞ্জিকা, গীতাঙ্কুর, যৎকিঞ্চিৎ, অভেদী প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গলা গ্রন্থের রচনা দ্বারা টেকচাঁদ ঠাকুর কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। শেষোক্ত তিন খানি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক।

খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। বঙ্গভাষায় তিনি অনেক পদ্য গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ তাঁহার দ্বারা বিশিষ্টরূপে উপকৃত হইয়াছে।

১৭৬০ শকে কাঁটালপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমাবস্থার খ্যাতিপ্রতিপত্তিবিশিষ্ট ছাত্র। বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় এবং তাঁহার রচনার সমালোচন পাঠকবর্গের গোচর করিতে হইলে স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী যখন প্রচারিত হইল, তখন বঙ্গীয়সাহিত্যপ্রিয় জনসাধারণ যেন কিছু নূতন পদার্থ পাইলেন বলিয়া পুলকিত হইলেন। উপন্যাস রচনায় তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, কমলাকান্তের দপ্তর, উপকথা (রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় ও ইন্দিরা), লোক রহস্য,

বিজ্ঞান রহস্য, সাম্য, বিবিধ সমালোচন, কবিতাপুস্তক, প্রবন্ধপুস্তক, আনন্দমঠ এবং দেবী চৌধুরাণী এই অষ্টাদশ খানি গ্রন্থের রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এই কয়খানি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম তিনখানি ভিন্ন আর সকল গুলিই তৎসম্পাদিত সুবিখ্যাত মাসিকপত্র বঙ্গদর্শনে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া শেষে পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ কবিত্তবিষয়ে যথেষ্ট সৌভাগ্যশালী। সদ্ভাব-শতক রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার অধিক গ্রন্থ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার এক সদ্ভাবশতকেই বিপুল কীর্ত্তি রহিয়া গিয়াছে। তিনি অকালে সংকটাপন্ন পীড়ায় স্বাস্থ্যশূন্য না হইলে বঙ্গভাষাকে অনেকগুলি সুন্দর অলঙ্কার প্রদান করিতে পারিতেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন একজন অতি যশস্বী কবি। তাঁহার অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, ক্লিওপেট্রা ও ভারতোচ্ছ্বাস এই কয়খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাধারণে পরম পরি-তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বসুর কবি কাহিনী ও মানসবিকাশ এবং আনন্দচন্দ্র মিত্রের মিত্রকাব্য ও হেলেনা কাব্য যে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের পরম শোভনীয় পদার্থ, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? ঢাকার মৃত হরিশ্চন্দ্র মিত্রও একজন সুকবি ছিলেন। তিনি অনেক কাব্য লিখিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাসিতা সীতা অতি উপাদেয় কবিতা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের দুই একটী গীতের রচনা-পারি-পাট্য দেখিয়াই আমরা তাঁহাকে সুকবি বলিয়া জানিতে

পারিয়াছি। তৎকৃত যমুনা-লহরী নামক গীতি দেশ-বিখ্যাত।

বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ একজন বিখ্যাত গদ্যলেখক। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ মাত্রেই রচনাচাতুর্য্যের ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার প্রসাদে বান্ধবে অনেক নূতন নূতন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো নিবাসী মৃত মহাত্মা কালী-প্রসন্ন সিংহ বাঙ্গলা গদ্যে মহাভারত প্রকাশ করিয়া দেশের যে কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি প্রায় একলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহাভারত মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া দুই সহস্র খণ্ড বঙ্গদেশ মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার হুতোম পেঁচার নক্সা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা নহে—টেকচাঁদী ভাষার অনুরূপ, কিন্তু চিত্রগুলি অতি পরিপাটী।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয়েরা বঙ্গভাষার উন্নতি-পক্ষে সামান্য যত্নবান নহে। মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর স্বয়ং কোন গ্রন্থের রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার যত্নে ও উৎসাহে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীতশাস্ত্রের অনেকগুলি বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। এদিকে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকু-রের সন্তানগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহাদের ভগ্নী শ্রীমতী

স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সুন্দররূপে পরিচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ প্রগাঢ় কবিত্বের ভাণ্ডার। গীতরচনায় সত্যেন্দ্রনাথ বিশিষ্টরূপে বিখ্যাত। পুরুবিক্রম নাটক, সরোজিনী নাটক, অশ্রুমতী নাটক, কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রহসন প্রভৃতি পুস্তকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। নানা রূপ সম্ভাব পূর্ণ, সুললিত কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেশ মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দীপ নির্ব্বাণ, ছিন্নমুকুল মালতী, পৃথিবী প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী বঙ্গ মহিলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতা সুকবি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা বঙ্গভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থগুলি একত্র করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কি সাহিত্য কি ভূগোল, কি ইতিহাস, সর্ব্ববিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া, স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উত্তীর্ণ ও গণনীয় ছাত্র।

শ্রীযুক্ত হরলাল রায় কয়েক খানি নাটক লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় একজন সুকবি। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্য রামায়ণ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে; উহা দ্বারা বঙ্গসমাজের যে বহুল পরিমাণে উপকার সাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গদ্য রামায়ণ সম্বন্ধেও অন্যমত নাই।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ যদিও বঙ্গাধিপ পরাজয় ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থের রচনা করেন নাই, কিন্তু তাহাতেই তাঁহাকে সুলেখক বলিয়া জানিতে পারা যায়।

শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী অপূর্ব্ব কারাবাস ও অপূর্ব্ব সহবাস দুইখানি উপন্যাস দ্বারা পাঠক সমাজে পরিচিত আছেন।

সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গভাষায় কতিপয় উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লেখনী ইংরাজী বাঙ্গলা উভয়বিধ রচনায় নিপুণতা লাভ করিয়াছে।

বহরমপুর নিবাসী বিখ্যাত পুরাতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত রামদাস সেন বিবিধ প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধার করিয়া বঙ্গদেশেকে বিবিধ প্রকারে উপকৃত করিতেছেন।

তথাকার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় উদ্ভ্রান্ত প্রেম নামক এক খানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়া সাহিত্য সংসারে পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত জয়দেবচরিত, পাণিনি, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, প্রবন্ধমালা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থের দ্বারা বঙ্গদেশমধ্যে পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ প্রচার করিয়া সাধারণের সাতিশয় উপকার করিয়াছেন।

কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংকলিত পদ্যপাঠ মধ্যে তিনি কতিপয় স্বরচিত কবিতাপ্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেগুলিতে সুন্দর কবিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ৮ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তত্রত্য অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দত্ত উভয়ের প্রণীত অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ আছে।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখনী অবিরল বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রসব করিতেছে।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বালকশিক্ষার উপযোগী কতিপয় গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে রামের রাজ্যাভিষেক অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী অনেকগুলি গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একখানি উপন্যাস, একখানি পদ্য ও একখানি গণিত গ্রন্থ প্রধান।

শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বাঙ্গলা ব্যাকরণ গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন।

নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ইতিহাস ও ভূগোল লিখিয়া অনেক দিন হইল যশস্বী হইয়াছেন। তত্রত্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধনোদ্দেশে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন।

মহেশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বঙ্গভাষার উন্নতিজন্য বিশিষ্টরূপ যত্ন করিতেছেন। তাঁহার প্রণীত নরদেহ নির্ণয় তত্ত্ববিষয়ক আদি গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনোদ্দেশে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

কলিকাতা সিমুলিয়াপল্লী নিবাসী ৮ রামকমল ভট্টাচার্য্য ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য উভয়েই বাঙ্গলা

গ্রন্থ রচয়িতার পদবী লাভ করিয়াছেন। রামকমলের জ্যামিতি অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচায়ক। উহা একপ্রকার নূতন গ্রন্থ বলিলেই হয়।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দশকুমারচরিতের অনুবাদ ও শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন বিরাটপর্ব্ব ও রচনাবলী প্রভৃতির রচনা দ্বারা সুপরিচিত।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী পাটীগণিত ও বীজগণিত এই উভয়বিধ গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক ইউক্লিডের জ্যামিতির এক অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রচারিত করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষার্থিগণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোস গণিত বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত।

তত্রত্য শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল কতিপয় নাটকের দ্বারা সাধারণ্যে পরিচিত।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পতরু ও ভারত-উদ্ধার গ্রন্থে পরিহাসরসিকতার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তৎসম্পাদিত পঞ্চানন্দ অনেকেই সানন্দে পাঠ করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী গদ্য পদ্য উভয়বিধ রত্নের হার অর্পণ করিয়া বঙ্গভাষাকে শোভমানা করিয়াছেন। তৎপ্রণীত নির্ব্বাসিতের বিলাপ অতি উপাদেয় কাব্য।

শ্রীযুক্ত বলদেব পালিত অনেকগুলি কবিতাপুস্তকের জন্য সাহিত্যসমাজে পরিচিত। বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দের অবতারণা করিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বলদেব বাবুর ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী দুরবগাহ বৈদিক ধর্ম্মের মর্ম্ম ও তদানুষঙ্গিক দার্শনিক মতসমূহের বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশকে উপকৃত করিয়াছেন।

শরৎসরোজিনী ও সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটক প্রচারদ্বারা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

কুমারখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার প্রণীত বাঙ্গলা গ্রন্থগুলি সাধারণে সদ্গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত। তিনি প্রণয়-পরীক্ষা নাটক, রামাভিষেক নাটক, হরিশ্চন্দ্র নাটক, সতী নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী নন্দবংশোচ্ছেদ প্রভৃতি কতিপয় নাটক রচনা করিয়াছেন।

রাণাঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক চরিতাষ্টক ও ছিন্নমস্তা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দানব দলন কাব্য রচনা করিয়াছেন।

যশোহরজেলার অন্তঃপাতী কায়বা নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে বঙ্গভাষায় মানবতত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

মহেশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি কাব্য-নির্ণয় ও সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র পারদর্শী চিকিৎসকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশের উপকার সাধনের জন্য দুরূহ চিকিৎসাশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বাঙ্গলাভাষায় তাহার সারভাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, ৺ দুর্গাদাস কর, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গরিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি সমধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ। শেষোক্ত মহাশয়ের লেখনী অবিরত গুরুতর প্রয়োজনীয় পুস্তক সমস্ত প্রসব করিতেছে। সরল ভাষায় মনের কথা পাঠককে বুঝাইয়া দিতে ইঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা।

কলিকাতার অন্তঃপাতী মাণিকতলার নিকট শিবতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বর্ণাকুলার লিটরেচর সোসাইটীর সাহায্যে অনেকগুলি গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সুশীলার উপাখ্যান স্ত্রী-সমাজে সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে।

৺ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ রঘুবংশের বাঙ্গলা অনুবাদ দ্বারা পাঠক সমাজে পরিচিত।

৺ কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাকুসুমাঞ্জলি ও সরল ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণয়ন দ্বারা প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।

মিত্রাভকবচবধ কাব্যকার গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ভার্গববিজয় কাব্যের প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় গুপ্তকথা প্রভৃতি উপন্যাসের রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর রাজবাটীর ভুতপূর্ব্ব প্রধান সচিব ৺ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত ও গীতমঞ্জরী রচনা দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন।

তত্রত্য শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মৃণ্ময়ী, বিমলা, দুই ভগ্নী, প্রতাপসিংহ, মা ও মেয়ে, কমলকুমারী, শুক্লবসনা সুন্দরী এই সাতখানি উপন্যাস ও তিন ভাগ পাঠমালা গ্রন্থের দ্বারা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে অনেকেই বঙ্কিম বাবুর নিম্নেই তাঁহাকে আসন প্রদান করেন।

কালনা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, শিশু ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন।

কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব অধ্যাত্মবিজ্ঞান গ্রন্থের প্রণয়ন করেন।

রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ দাস জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক থাকিয়া রচনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তৎপ্রণীত সভ্যতার ইতিহাস একখানি প্রশংসার্হ গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় শব্দদীধিতি অভিধান, সরল অভিধান, বিবিধ শিক্ষা ও নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাষাণ প্রতিমা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রকৃতিবাদ অভিধান প্রচার দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

গোস্বামী দুর্গাপুরের ৺ দ্বারকানাথ অধিকারীর সুধী-রঞ্জন একখানি সুন্দর গ্রন্থ।

বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর ও বান্ধব এই চারি খানি মাসিক পত্রদ্বারা বঙ্গভাষার ভূরি ভূরি উপকার সংসাধিত হইয়াছে—পাঠকবর্গ মাসে মাসে নূতন নূতন বিষয় পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, এবং অনেক অজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব্ব তত্ত্বের আবিষ্কার ও আলোচনায় সম্পাদক মহাশয়েরা সময়ে সময়ে পাঠকবর্গকে পুলকিত করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ কয়খানি পত্রের মধ্যে কোন খানি লুপ্ত, আর কোন খানি বা প্রভাশূন্য হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার নবজীবন, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী নব্যভারত এবং কোন অপ্রকাশিত সম্পাদক প্রচার নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে মার্সমান সাহেব সমাচার দর্পণ নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাই এদেশে সংবাদপত্রের প্রথম সূত্রপাত। এক সময়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা দেশমধ্যে বড় আদরের বস্তু হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ৺ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড়্গুড়ে) সম্পাদিত সংবাদভাস্কর, প্রভাকরের প্রতিদ্বন্দ্বী পত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে যে কত সাময়িক ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। বর্ত্তমান সংবাদপত্র শ্রেণীর মধ্যে নববিভাকর

প্রধান বলিয়া খ্যাত। গ্রাহকের সংখ্যাধিক্যে বঙ্গবাসী নামক নূতন সংবাদ পত্র অতুলনীয়। বঙ্গবাসীর অনুকরণে যে সকল সংবাদ পত্র প্রচারিত হইয়াছে তন্মধ্যে সঞ্জীবনী, সময় ও ভারতবাসী বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার সহচর, সাধারণী ও ভারত মিহির ঢাকার ঢাকাপ্রকাশ ও সারস্বত পত্র, চাঙ্গরিপোতার সোমপ্রকাশ, বোয়ালিয়ার হিন্দুরঞ্জিকা, রঙ্গপুরের রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, মুরশিদাবাদের মুরশিদাবাদ-পত্রিকা ও প্রতিকার, বরিশালের হিতসাধিনী, আসামের ময়মনসিংহের, চারুবার্ত্তা ইত্যাদি গণনীয়।

কলিকাতায় অদ্যাপি সংবাদপ্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয় এবং বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা এই তিনখানি প্রাত্যহিক পত্র বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহাতে এক্ষণে দেশের কোনই উপকার নাই। সম্প্রতি দৈনিক নামে একখানি নূতন প্রাত্যহিক পত্র প্রচারিত হইতেছে। সংবাদ পত্র দ্বারা বঙ্গভাষার অনেক উপকার হইয়াছে ও হইতেছে।

আমরা এস্থলে অনেক গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করি নাই; বর্ত্তমান কালের সকল গ্রন্থকারই যে উল্লেখের যোগ্য আমরা এমন মনে করি না। ভ্রমক্রমে যদি আমরা কোন উপযুক্ত গ্রন্থকারের নামোল্লেখ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সাহিত্য-রত্নাবলী।

কবির প্রার্থনা।

নমি আমি কবিগুরু, তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর কালিদাস—সুমধুর ভাষী,
মুরারি-মুরলী ধ্বনি-সদৃশ মুরারি,
মনোহর, কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব

(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

মেঘনাদবধ কাব্য।



আশীর্ব্বাদ।

যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয়পয়োধিজলে নিলীন হইলে, মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিযাছেন; যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলেব উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখরকুলিশ প্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্য-কশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি যমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবধামর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা মহাবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবন ছেদন করিয়াছেন এবং একবিংশতি বার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অরাতিশোণিত-জলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন; যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে দশরথ-গৃহে অংশ চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন; যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধ দ্বারা

ভূমির ভার হরিয়া অশেষপ্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি বেদমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশানামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল করবাল ধারণপূর্ব্বক দেববিদ্বেষী, ধর্ম্মমার্গ-পরিভ্রষ্ট, নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিতদণ্ড বিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকীনাথ বৈকুণ্ঠ-স্বামী ভূতভাবন ভগবান আপনকার রক্ষা করুন।—

বেতাল পঞ্চবিংশতি।

শিবের ভিক্ষাযাত্রা।

ভবানীর কটুভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে,
ক্ষুধানলে কলেবর দহে,
বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত,
বৃদ্ধলোকে ক্ষুধা নাহি সহে।
হেট মুখে পঞ্চানন, নন্দীরে ডাকিয়া কন,
"বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়,
আন শিঙ্গা হাড়মাল, ডমরু বাঘের ছাল,
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়;
আনরে ত্রিশূল ঝুলি, প্রথম সকল গুলি,
যত গুলি ধুতুরার ফল,
থলি ভরা সিদ্ধি গুঁড়া, লহরে ঘোটনা কুঁড়া,
ঝুটি [illegible] য় গঙ্গাজল।

ঘর উজাড়িয়া যাব, ভিক্ষায় যে পাই খাব,
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস,
নারী যার স্বতন্তরা, সেজন জীয়ন্তে মরা,
তাহারে উচিত বনবাস।
বৃদ্ধকাল আপনার, নাহি জানি রোজগার,
চাসবাস বাণিজ্য ব্যাপার,
সকলে নির্গুণ কয়, ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়,
নাম মাত্র রহিয়াছে সার।
যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই,
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।"
এত বলি দিগম্বর, আরোহিয়া বৃষোপর,
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া।
শিবের দেখিয়া গতি, শিবা কন ক্রোধমতি,
'কি করিব একা ঘরে রয়ে,
বৃথা কেন দুঃখ পাই, বাপের মন্দিরে যাই,
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে।
যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহিণী কেন,
নাহি ঘরে সদা খাই খাই,
করে গৃহিণী পণে, খন খন ঝন ঝনে,
আসে লক্ষ্মী বাস বান্ধে নাই।
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস,
রাজসেবা কত খচমচ,
গৃহস্থ আছয়ে যত, সকলের এই মত,
ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ।"

হইয়া বিরস মন, লয়ে গুহ গজানন,
হিমালয়ে চলিল অভয়া,
ভারত বিনয়ে কয়, এমন উচিত নয়,
নিষেধ করিয়া কহে জয়া।—

অন্নদামঙ্গল।

আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশ।

আর্য্যেরা কি শুভদিনে ও কি শুভক্ষণে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে পদার্পণ করিয়াছিলেন! ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরকালে যে অত্যুন্নত অতি দুর্লভ গৌরবপদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, * তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারতভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ-বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী † জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটি অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ইতিহাস এককালেই বর্ণন

---

* কবীন্দ্র কালিদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, এরূপ জন-প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও পুস্তকমধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

† ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্র।

করিতেছে, এবং জাহ্নবী-জল-পবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রা-সলিল সুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতিবিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্যরূপ অমূল্য রত্নের আকরস্বরূপ যে আয়ুপ্রদ শুভকর শাস্ত্র অবহমানকাল স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় অসংখ্যলোকের রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে স্বাস্থ্যগুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোকসন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে, ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ বিশেষের শক্তিযোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারতক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছে, এবং সে দিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূরশেখর শিখ জাতির হৃদয়-চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্য-ভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র-কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষ প্রবেশ করিয়েছেন, ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়। ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আত্ম

শাখা সমন্বিত সলিলপূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গম করিয়া আনি ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের পদাম্বুজ রজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।—

উপাসকসম্প্রদায় ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতনে রামের খেদ।

রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ সলিলে মগ্ন তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
আরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃ কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি

মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘব কুল-চূড়া, তব কুল-বধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে,
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীর বীর্য্যে সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুল-জয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে।
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি ;
অধীর কর্ব্বরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুর্ব্বার রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি—
অভাগিনি ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী,
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব,
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব সুধিবেন যবে,
মাতা, "কোথা রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?" কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?

উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেম-বশে,
রাজ্যভোগ তাজি তুমি পশিলা কাননে।
মম দুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক্? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি,
শিশির আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত, প্রাণ দান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষণে—
বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"—মেঘনাদবধ।

নীতিবাক্য।

ব্যাধি, অনিষ্টাপাত, পরিশ্রম ও ইষ্টবিনাশ, এই চতুর্ব্বিধ কারণ শারীরিক দুঃখের প্রবর্ত্তক। প্রতীকার দ্বারা ব্যাধির ও অননুধ্যান দ্বারা আধির শান্তি হয়। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান বৈদ্যেরা প্রথমেই প্রিয় কথন ও ভোগ্য বিষয় প্রদান করিয়া মানবের মানসিক দুঃখ প্রশমিত করেন। যেমন অয়ঃপিণ্ড পরিতপ্ত হইলে তদ্দ্বারা কুম্ভস্থিত জলও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে শরীরও পরিতাপিত হয়। যেমন জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবে। মনোব্যথা প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও

বিনষ্ট হইয়া যায়। স্নেহ মানসিক দুঃখের মূল; অতএব স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। স্নেহ কেবল দুঃখেরই মূল এমত নহে, উহা ভয়, শোক, হর্ষ এবং আয়াসেরও প্রবর্ত্তক। স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয়। এই দুই দোষের মধ্যে প্রথমটী অতিশয় গুরুতর। কোটরস্থিত অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদায় অংশ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্তি অত্যল্প হইলেও সমুদায় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে। বিষয় হইতে বিমুক্ত হইলেই বিষয়-ত্যাগী হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয় সমাগম সময়েও দোষদর্শী, নির্ব্বিরোধ ও নিরবগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বৈরাগ্য লাভ করে। অতএব অর্থ সঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে স্নেহ লাভ করিবার অভিলাষ করিবে না, এবং জ্ঞান দ্বারা স্বীয় স্নেহকে বিনিবর্ত্তিত করিবে। জল যেমন পদ্মপত্রে সংসক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ স্নেহও জ্ঞানবান কৃতাত্মা শাস্ত্রজ্ঞ যোগীতে আসক্ত হইতে পারে না।

বিষয়ানুরাগ হইতে কামনা উৎপন্ন হয়, কামনা হইতে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা সংবর্দ্ধিত হয়। এই সর্ব্ব-পাপময়ী তৃষ্ণা নিয়ত উদ্বেগকরী, অধর্ম্মবহুলা এবং পাপ-প্রসবিনী। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, পুরুষ জীর্ণ হইলেও যে জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ তৃষ্ণাকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখী। এই তৃষ্ণা নরগণের পরিমিত দেহের অন্তর্গত বটে, কিন্তু ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই; ইহা অযোনিজ অনলের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে বিনষ্ট করে। কাষ্ঠ যেমন স্বসমুত্থিত হুতাশনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ অকৃতাত্মা

ব্যক্তি সহজাত লোভ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণিগণ যেমন মৃত্যুকে ভয় করে, সেইরূপ অর্থবান ব্যক্তি রাজা, সলিল, অগ্নি, চোর ও স্বজন হইতে প্রতিনিয়ত ভয়প্রাপ্ত হয়। যেমন আমিষ আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূতলে শ্বাপদগণ ও সলিলে মৎস্যগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনবান ব্যক্তি যেথানে থাকুক, সর্ব্বত্রই আক্রান্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তির অর্থ কেবল অনর্থেরই মূল হইয়া উঠে। যে মনুষ্য অর্থে একান্ত আসক্ত, সে অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ই লাভ করিতে পারে না। এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রকার অর্থাগমকে লোভ, মোহ, কৃপণতা, দর্প, অভিমান, ভয় ও উদ্বেগের মূলীভূত বলিয়া জানেন। লোকে অর্থের উপার্জ্জন, রক্ষণ ও ব্যয় এই তিন বিষয়েই যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে। অনেকে অর্থের নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত অতি কষ্টে অর্থ রূপ শত্রুকে লাভ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু উহা যে প্রাণনাশেরও কারণ হইয়া উঠে, তাহা একবারও চিন্তা করে না।

মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষ পরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই; সন্তোষই পরম সুখ; এই জন্য পণ্ডিতগণ এই সংসারে সন্তোষকে প্রধান বলিয়া জানেন।—কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।

শেষ সমরে ভীম সিংহের প্রবেশ।

সমরে মরিল জ্যেষ্ঠ কুমার সুন্দর,
শুনি নৃপমণি হন অত্যন্ত কাতর;

কিন্তু বজ্রাঘাত-প্রায় ক্ষণিক সে শোক,
হৃদয়ে উদয় ধৈর্য্য-সূর্য্যের আলোক।
একে ইস্‌লামের প্রতি দ্বেষ ঘোরতর,
তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি-পূর্ণিত অন্তর,
তাহে কুল-লজ্জা-রক্ষা রাজকুল-ব্রত,
কোন ক্রমে সে কলঙ্ক না হয় সঙ্গত;
তাহে ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম চিরন্তন,
সাক্ষাৎ কৈবল্য-দাতা সমরে মরণ।
বিশেষে আশ্বাস-বারি-ত্যক্ত মনোমীন,
একেবারে জীবনের প্রতি মায়াহীন।
যেরূপ দীপের আলো ম্লান দিবাভাগে,
সেইরূপ শোক তাপ মনে নাহি লাগে।
পরদিন পুনঃ রাজা বিহিত আচারে,
রাজ্যপাটে বরিলেন দ্বিতীয় কুমারে;
তিনদিন অবসানে পাঠালেন রণে,
মরিল কুমার, যুদ্ধ করি প্রাণপণে।
এইরূপে একে একে দশ পুত্র হত,
ঘোরতর বিগ্রহেতে মাসাধিক গত।
শ্রীহীন চিতোরপুরে দিনে অন্ধকার,
কেবল বিশ্রুত রমণীর হাহাকার।
যে ছিল পুরুষমাত্র রাজ-সন্নিধান,
চিতোর হইল নারী-রাজ্যের সমান।
একদা বসিয়া ভীমসিংহ দরবারে,
কহিছেন সম্বোধিয়া যত সরদারে;—
"মরিল সকল পুত্র বাকি মাত্র এক,

করিব তাহারে অদ্য রাজ্যে অভিষেক।
তারে রাখি রাজ্যপাটে আমি যাব রণে,
লভিব অক্ষয় স্বর্গ জীবন-অর্পণে।
শত্রু হস্তে পরিত্রাণ হেতু নারীগণ,
প্রাণত্যাগ করিবেক প্রবেশি দহন।"
শুনিয়া অজয় সিংহ পিতার বচন,
করপুটে ভূপতিরে করে নিবেদন;—
"অনুচিত কথা কেন কন মহারাজ?
এবার সমরসজ্জা সেবকের কাজ।
এই তো কালীর বাণী আপনার প্রতি,
না দিলে এগার পুত্র নাহি অব্যাহতি।
আপনি যাবেন যদি সাজিয়ে সমরে,
কহ তাত মঙ্গল হইবে কার তরে?
কি ছার আমার এই অসার জীবন,
তব নাশে রাজ্য-আশে করিব বঞ্চন?
অনুমতি দেহ পিতা, রণে যাই আমি,
তব কার্য্যে প্রাণ ত্যজি, হই স্বর্গগামী।"
শুনিয়ে পুত্রের কথা সজল নয়নে,
কহিলেন ভীমসিংহ অমিয় বচনে;—
"কেন বাপ অযুক্ত কথায় আস্থা রাখ,
প্রবোধ চন্দনে স্বীয় মন-পুষ্প মাখ,
দেখ দেখি বিচারিয়া মনের ভিতর,
কি আছে মঙ্গল মম ইহার অন্তর?
মরিল সকল লোক জ্ঞাতি বন্ধুগণ,
পুত্র হত, পত্নী হত, চ্যুত সিংহাসন;

প্রবল বিজয়ী বৈরী ঘোর অত্যাচারী,
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তার কি করিতে পারি ?
অতএব আমার মঙ্গল কোথা আর,
মরণ মঙ্গল মম এই জ্ঞান সার।"
এইরূপে পিতা পুত্রে বাদ অনুবাদ,
উভয়ের মনে, প্রাণ প্রতি অবসাদ।
শেষেতে রাজার বাক্য হইল প্রচার।
"সাজ সাজ" শব্দে পূর্ণ আকাশ মণ্ডল।—প, উ

স্বার্থপরতা।

সকলেই স্বার্থসাধনে ব্যস্ত সত্য বটে, কিন্তু অতিশয় স্বার্থপর ব্যক্তি কখনই সাধুপদ বাচ্য হইতে পারে না। আত্মনার ব্যক্তিরা পরের অনিষ্ট করিয়াও স্বার্থসাধন করিতে সঙ্কুচিত হয় না। আপনার মঙ্গলের চেষ্টা করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে, কিন্তু পরের অমঙ্গল ঘটাইয়া নিজ মঙ্গলের উপায় দেখিলে লোকস্থিতি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মনুষ্যজাতির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ পরস্পর আনুকূল্য অপেক্ষা করে বলিয়া তাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, কিন্তু সকলে স্বার্থসাধনার্থ পরস্পর প্রতিকূলাচরণ করিলে কখনই জনসমাজ সুশৃঙ্খল হইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের এবং যাহাদিগের হস্তে সাধারণের গুরুতর অর্থ সকল ন্যস্ত আছে, তাঁহাদিগের স্বার্থপর হওয়া একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম। রাজ্যেশ্বর স্বার্থপর হইলে তত হানি নাই। তাঁহার অর্থ কেবল তাঁহার একের অর্থ নহে; তাঁহার স্বার্থ ব্যাঘাত

হইলে রাজ্যশুদ্ধ লোকের অনর্থ হইবার সম্ভাবনা। অনেকে যাঁহার আশ্রিত ও যাঁহার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করে, তাঁহার স্বার্থপরতা বরং একদিন শোভা পায়. কিন্তু রাজপুরুষ বা পৌরজন সর্ব্বদা আত্মসার হইয়া চলিলে কোনরূপে রাজ্যের ভদ্রস্থতা নাই। যাঁহাদিগের প্রতি দৌত্য, সৈনাপত্য, কোষাধিকার প্রভৃতি গুরুতর ভার অর্পিত থাকে, তাঁহাদের এই প্রবল দোষ থাকাতে কত রাজ্য উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, কত জনপদ শুদ্ধ তাঁহাদিগের নিজের জিগীষা, লোভ, তুচ্ছ মানস্পৃহা ও বৈরসাধনের নিমিত্ত অনর্থক সমরাড়ম্বরে ব্যাপৃত হইয়া হতসার ও হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। যাহারা যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত প্রভুর প্রভূত ক্ষতি করিতে প্রস্তুত হয়, তাহারা প্রতিবেশীর গৃহ প্রজ্বালিত করিয়া অগ্নিসেবা করিতে সঙ্কোচ করে এমত বোধ হয় না।

ফলে আত্মম্ভরিদিগের অভ্যুদয় অধিককাল স্থায়ী হয় না। পরকে মজাইয়া স্বোদর পূরণ করিলে কখনই সুখে কালক্ষয় হয় না। দশজনের ধিক্কার ও আত্মগ্লানির নিমিত্ত সদাই সঙ্কুচিত থাকিতে হয় এবং দশাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে কেহই তদীয় ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অনুকম্পা প্রকাশ করে না। —বেকনের সন্দর্ভ।

ভুচিত্র।

অহহ! ভুচিত্র তুমি ভিত্তির মাঝারে
নীরবে দুলিছ কেন বল না আমারে?

নৰ্ম্ম সখা খুলি যথা মনের কবাট
দেখায় প্রাণের মিত্রে হৃদয়ের নাট,
সেইরূপ অকপটে খুলিয়া অন্তর
দেখাইছ ধরণীর মুরতি সুন্দর।
পদব্রজে বহুকাল ভ্রমি চরাচরে
না হেরে নয়ন যাহা, তোমার অন্তরে
অনায়াসে হেরি তাহা আনন্দে অধীর
হইয়া ত্যজয়ে কভু পুলকাশ্রু নীর।
হরিদ্বার, গয়া, সোমনাথ, হিমালয়
অনায়াসে দেখাইছ খুলিয়া হৃদয়।
"মনোহর স্থান সেই বদরী ভবন—
সত্যবতী-সুত ব্যাস নন্দন-কানন,"
এই কথা পুরাণেতে শুনিয়া শ্রবণে,
মানস-বিহঙ্গ ধায় দেখিতে নয়নে,
কিন্তু ভূমি চিত্র! তুমি সদয় হইয়া
দেখাইছ সেই স্থান হৃদয় খুলিয়া।
এই কি সংসার মাঝে পুরী দ্বারাবতী,
যথায় কিশোর কৃষ্ণ করিয়া বসতি,
গাঁথিয়া কোমল করে মন্দারের মালা
সাজান মনের সুখে সত্রাজিত বালা?
এই কি সে কাশীধাম ত্রিদিব সমান,
যথায় যাপেন কাল করি সামগান
যতেক পরম হংস সুমধুর স্বরে?
ধন্য হে ভূচিত্র তুমি ধরণী ভিতরে!
হিমালয় নামে গিরি অতি মনোহর,

যথায় ভবানী সহ থাকেন শঙ্কর ;
তোমার হৃদয়ে যেন নীলকান্ত হার
রুচির শোভায় আহা শোভিছে অপার!
ভারত-হৃদয় ভেদি বিন্ধ্য-গিরি বর,
শোভিয়া রয়েছে কিবা দেখিতে সুন্দর।
এই কি সে চিত্রকূট,—শোভিত শোভায়
ত্রিদিব-নর্ত্তকী কুল নাচেন যথায়?
কতশত স্রোতস্বতী বাহু পাশরিয়া
ধাইছে সাগর-মুখে ব্যাকুল হইয়া।
কালিন্দী সখীর কর ধরিয়া যতনে
এই কি ধাইছে গঙ্গা কুটিল-গমনে।
যথায় শ্রীরামচন্দ্র করেছেন লীলা
এই কি সে গোদাবরী প্রসন্ন-সলিলা?
এই কি সে চন্দ্রভাগা পবিত্র কারিণী
এই কি সে সরস্বতী ত্রিতাপ-নাশিনী?
অতি বেগে মিসরের হৃদয় ভেদিয়া
এই কি সে নীলনদ যাইছে ধাইয়া?
'ব্যাবিলন নামে সেই সুখের ভবন
এই কি, নীরবে কাল করিছে যাপন?
এই কি, নগরী রোম বীর-প্রসবিনী
শোকে যাপিতেছে কাল বসি একাকিনী?
অনাথ রমণী যথা নিবিড় কাননে
কাঁদে একাকিনী বসি বিষণ্ণ বদনে।
এই কি বিলাত নামে লণ্ডন নগর
সাগর-হৃদয়ে যাহা শোভিছে সুন্দর?

কেশবের শ্যাম অঙ্গে সোণার পদক
শোভে যথা মাঝে করি উজ্জ্বল হীরক।
এই কি প্যারিস্ অহো—বিলাস-ভবন
শত শত ভাবুকের চিত্ত বিনোদন?
অসংখ্য ঝরনা আহা করি কলতান
ঝর ঝর গাইতেছে ঈশ্বরের গান;
কতশত মরুস্থলী হেরিয়া নয়নে
উঠিতেছে ভাবের লহরী মনে মনে।
কতশত গণ্ডশৈল তুলিয়া শিখর
শোভিয়া রয়েছে ধরণীর কলেবর।
এই কি সে পিরামিড্ উন্নত শিখর
যাহা বহিতেছে পৃষ্ঠে করিয়া মিসর?
শত শত কোটি-পাত তৃণ সম গণি
সমভাবে আছে যেন বীর-চূড়ামণি।
এই কি সাহারা মরু অতি ভয়ঙ্কর,
যাহা হেরি পথিকের কাঁপয়ে অন্তর?
ভূমধ্য সাগর দ্বীপে পদভর দিয়া
পিত্তল-প্রতিমা এক আছে দাঁড়াইয়া,
কতশত পোত তার উরু-তল দিয়া
যাইতেছে দেশান্তর সাগর ভেদিয়া,
এই কথা শুনিয়াছে শ্রবণ-যুগল
কিন্তু তুমি চিত্র বল তাহায় কি ফল!
যদি তাহা দেখাইতে পার একবার
তা হলে আনন্দরস উছলে আমার।
হয়ত সহস্র মরু, তটিনী, কানন,

অজ্ঞাত ভাবেতে কাল করিছে যাপন,
এই ভাবি কত ভাব উঠিছে যে মনে
দুর্ব্বল রসনা তাহা বলিবে কেমনে ?—চারুপাঠ।

পদ্মাবতী বর্ণন।

মালবদেশে পদ্মাবতী নামে এক নগর আছে। পদ্মাবতী নগর অতি মনোহর, সিন্ধু ও মধুমতী নামে দুই নদীর সঙ্গমস্থলে সন্নিবেশিত। ঐ স্থানে বিশাল বিমল বারিরাশির অন্তরালে নানাবিধ সুরম্য হর্ম্মের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন আকাশ হইতে অধোমুখ করিয়া স্বর্গপুরীকেই পরিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ খানে লবণা নামে আর একটী নদী আছে। তাহার পুলিনদেশ সুস্নিগ্ধ নবতৃণে সুশোভিত। ঐ স্থানের অনতিদূরে সিন্ধুনদীর এক প্রকাণ্ড জলপ্রপাত আছে। তাহার জল এত বেগে পড়ে, যে দেখিলে বোধ হয়, যেন রসাতল পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ অন্তরে বৃহৎ দ্রোণী নামে এক শৈল আছে। তাহার পরিসর শাল তাল তমাল রসাল প্রভৃতি তরুমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে রমণীয় নিকুঞ্জবন, দরীগৃহে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ বাস করে। ক্ষণে ক্ষণে ভল্লুকেরা বিকট স্বরে অস্ফুট চীৎকার করিয়া হীনবল জীবদিগকে চকিত করিয়া দেয়। হস্তিগণ শৈলজাত সুগন্ধি তরুলতা দলিত করে, তদীয় আমোদে বন অতিমাত্র সুবাসিত হয়। ঐ স্থানে সুবর্ণবিন্দু নামে প্রসিদ্ধ চরাচর গুরু ভগবান্ মহাদেবের এক মন্দির আছে।—মালতীমাধব।

ঈশ্বরপরায়ণ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু প্রতি উক্তি।

ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকি মন
অনিত্য সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ;
যারা এই ভবরূপ অতিথি ভবনে
চিরবাসস্থান বলে ভাবে মনে মনে;
পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসনে
করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ;
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়
পরমেশ-প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয়;—
হেরিলে নয়নে এই ভ্রুকুটী তোমার,
তাঁহাদের হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রুভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত।
কোন রূপে অতিক্রম করিলে তোমায়,
সফল হইবে আশা, যাইব তথায়।—সপ্তাদশতক।

আশা।

আশাবৃত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণে সতত তৎপর। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে মনোরথ পূর্ণ হয়, যে পৃথিবীতে উপার্জ্জন করিয়া উদরান্ন আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ সুখলাভের প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান দুঃখানুভবের হ্রাস করিতে হয়, এই আশাবৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক উপযুক্ত। যখন হৃদয়াকাশ, বিষয়বিপত্তিরূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল প্রবল আশা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে। যখন আশার সহিত কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন অন্তঃকরণ স্বার্থপরায়ণ হইয়া আত্মসুখ সাধনেই ব্যগ্র থাকে। আর যখন কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয়, বিশ্বসংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক। ইহলোকে পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে অবশ্যই ইষ্টলাভ হয়, এই-রূপ বিশ্বাস রাখিয়া আশাবৃত্তি চালিত ও চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কেবল ইহকাল ও ভূমণ্ডল মাত্র আশার বিষয় নহে। জিজীবিষা বৃত্তির সহিত তাহার সংযোগ হইলে শতবর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না। তখন এই শতবৎসরকে অতি অল্পকাল বোধ হয়, এবং এ জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়। তখন মনে হয়, অনন্ত কালই আমার পরমায়ু, এবং অখিল সংসারই আমার নিত্যধাম। আমি এই জঘন্য দেহপঞ্জর হইতে উড্ডীয়মান হইব, লোক লোকান্তর গমন করিব, সর্ব্বত্র বিচরণ করিব, জ্ঞানতৃষ্ণা শান্তি করিব এবং পূর্ণকাম হইয়া অপ-

ব্যাপ্ত সুখ সম্ভোগ করিব। যদি কোন ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়া ভূমণ্ডল বিনাশ পায়, চন্দ্র সূর্য্য একবারে অন্তর্হিত হয়, এবং ঐ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব স্থান হইতে চ্যুত হইয়া দিগ্বিদিক্ ঘূর্ণায়মান হইয়া ভগ্ন ও চূর্ণ হয়,—এই জাজ্বল্যমান জগৎ যদি অসৎ হইয়া যায়, তথাপি আমি বর্ত্তমান থাকিব। আশাবৃত্তি মর্ত্ত্যলোকের বিষয়োপভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া অলৌকিক সুখাশয়ে এইরূপ সঞ্চরণ করিতে থাকে। তাহাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারে এত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে নাই।—

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১ম ভাগ।

রামচন্দ্রের প্রতি বালির ভৎর্সনা।

ভূমে পড়ি বালিরাজ করে ছট ফট,
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে,
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে।
রক্ত নেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি,
দন্ত কড়মড় করে আর দেয় গালি।
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে,
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে।
রাজকুলে জন্মিয়ে নাহি ধর্ম্মজ্ঞান,
আমারে মারিলা রাম এ কোন্ বিধান।
শশক, গণ্ডার, কূর্ম্ম, গোধিকা, শল্লকী,
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ—এই পঞ্চনখী;
তার মধ্যে কেহ নহি, শুন রঘুবীর!

আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির।
আমার চর্ম্মের নাহি হইবে আসন,
মৃগ নহি, শাখামৃগে কোন প্রয়োজন?
নির্দ্দোষ বানর আমি মার কোন্ কার্য্যে,—
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে।
কোন্ দেশ লুটিয়া দিলাম কারে ক্লেশ?
কোন্ দোষে করিলা আমার আয়ুঃশেষ?
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে:
ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে।
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলা না জানি,
অপরাধ বিনা বিনাশিলা মহাপ্রাণী!
সবে বলে, "রামচন্দ্র দয়ার নিবাস",
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ।
তপস্বীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে,
কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে।
সর্ব্বলোকে বলে "রাম ধর্ম্ম অবতার,"
ভাল রাম দেখাইলে সেই ব্যবহার!
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক,
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলা সুখ?
কোথায় না দেখি হেন, কোথায় না শুনি,
একের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় খুনী!
সম্মুখাসম্মুখী যদি মারিতে হে বাণ,
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ!
সম্মুখ সংগ্রাম বুঝি বুঝিলা কঠোর,
তেঁই রাম আমারে বধিলা হয়ে চোর!

জ্ঞাত আছ আমারে কেমন আমি বীর,
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির ?
সুগ্রীব আমার বাদী সাধি তার বাদ,
অবিবাদে তুমি কেন করিলা প্রমাদ ?
কেমনে দেখাবে মুখ বিশিষ্ট সমাজে,
বিনা দোষে, কপটে বধিলা বালি রাজে !
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম অবতার,
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার।
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন,
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন।
ধর্ম্মহীন মান্য ছিলা বাপের গৌরবে,
মিলিলা সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে !
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা,
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ?
বানর হইতে কার্য্য করিবে উদ্ধার,
তবে কেন আমারে না দিলে সেই ভার ?
এক লাফে পারাবার হইতাম পার,
এত দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার।
রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা,
কোন্ ছার মন্ত্রিসহ করিলা মন্ত্রণা ?
করিলাম কতশত বীরের সংহার,
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন্ ছার ?
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে,
লেজে বাঁধি ডুবাইনু চারি পারাবারে ;
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে,—

পায় পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে।
ত্রিলোক বিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব,
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব ?
যদি হয় হইবে বিলম্বে বহুতর,
মধ্যে এক ব্যবধান প্রলয় সাগর।
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার,
এত দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার।
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়,
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায়।
এ নহে বিচিত্র ভার আমি বালিরাজ,
আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ ?
বিস্তর ভর্ৎসিল রামে রণস্থলে বালি,
কৃত্তিবাস বলে কেন বালি দেহ গালি ?—কৃ, রা,

সুনিয়ম।

সংসারে সকল বিষয়েই সুনিয়ম করিয়া চলা আবশ্যক। নিয়ম-ভ্রষ্ট হইলে কখনই সুচারুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিই উহাতে বিরত। যাঁহারা সত্যনিষ্ঠাদি প্রধান ধর্ম্মবিষয়ে মহান্ আদর করিয়া থাকেন এমন লোকেও নিয়মের কোন কথা পড়িলে সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রদর্শন করেন, কাণও দেন না। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের অত্যন্ত অন্যায়। কতকগুলি কার্য্য স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, কতকগুলি তাহার পরিপোষক। নিয়মরক্ষা, সত্যনিষ্ঠাদির ন্যায়, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম না হইলেও, উহার প্রত্যবায়ে ধর্ম্মের প্রত্য-

বায় হয় বলিয়া, কি নীতিশাস্ত্র কি ধর্ম্মশাস্ত্র উভয়ত্রই উহ। অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

পৃথিবীতে যত দুষ্কর্ম্মশালী লোক আছে, তাহাদের কোন কার্য্যেই তাদৃশ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যাহা মনে হয়, তাহারা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সকল কার্য্যেই তাহাদের অনিয়ম। ইহাতে এমন অনুমান স্বতই হইতে পারে, অনিয়মই উহাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রয়োজক। যদি ঐ সকল ব্যক্তি সুনিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত, তাহা হইলে কখনই তত দুষ্কর্ম্মশালী হইত না। অতএব যদি নিয়মাবহেলন পাপের প্রয়োজক ও ধর্ম্ম-বিচ্যুতির কারণ হইল, তবে উহার প্রতিপালন যে ধর্ম্ম প্রতিপালনে সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? আর যখন ঐহিক যাবতীয় সৌভাগ্যই নিয়ম-প্রসূত দেখিতেছি, তখন উহা পারত্রিক সৌভাগ্যেরও সোপান বলিয়া অবশ্যই মানিতে হইবে। তোমরা কোন লোকের বৈষয়িক ব্যাপারে সাতিশয় অনিয়ম ও বিশৃঙ্খল দেখিলে, তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী ও অতি সন্নিহিত বলিয়া অনায়াসেই অনুমান করিয়া থাক; তবে সেই অনিয়ম ও সেই বিশৃঙ্খলাতে যে তাহার ধর্ম্মপথও কণ্টকিত করিতেছে, ইহা কেন না স্বীকার করিবে? অনিয়ম পাপের সনাতন সহচর; যেখানে অনিয়ম, তথায় পাপের সমাগম হইবার অবশ্য সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব যদি পাপে বিদ্বেষ ও ধর্ম্মে আস্থা থাকে, এবং ইহামুত্র সুখী হইতে চাও, তবে নিয়মের প্রতি গৌরব দৃষ্টি রাখ, ও সর্ব্বদা সকল কার্য্যেই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চল।—রচনাবলী।

ইংরাজ ও নবাবের যুদ্ধ।

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।
নাচিল সৈনিক রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃ কোলে শিশুগণ, করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।
নিনাদে সমর রঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীমরবে দিগঙ্গনে, কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
উঠিল অম্বর পথে করি ঘোর রোল।
ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল করে, দ্বিজ কোষাকুষি ধরে,
দাঁড়াইল বজ্রাহত পথিক যেমন।
অর্দ্ধ নিষ্কোষিত অসি ধরি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি, বারেক মা বসুমতী,
নিরখিল যেন এই জন্মের মতন।
ভাগীরথী উপাসক আর্য্যপুত্রগণ,
ভক্তিভাবে কিছুক্ষণ, করি গঙ্গা দরশন,
'গঙ্গা মাই' ব'লে সবে ডাকিল তখন।
ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্প ভরে, তুলি নিল অংশোপরে,
সঙ্গীন কন্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।
বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরবী গর্জ্জনে,
সলিল সঞ্চার করি, যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈল প্রতি তাড়িত গমনে।

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন, দলি গুল্ম লতাবন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।
তেমতি নবাবসৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি, এক স্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।
একেবারে অকস্মাৎ শতেক কামান,
করিল অনল বৃষ্টি, যেন বিনাশিতে সৃষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল তিরোধান।
অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয় মন, করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রাখিতে সেনায়।
'সম্মুখে' 'সম্মুখে' বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ ধার, ব্রিটিসের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।
ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি, নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগারিল কালান্ত অনল।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে, চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।
পাখিগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে, গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়া হাঁকা'ল সঘনে॥
আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন,

উগারিল ধূম রাশি, আঁধারিল দশ দিশি
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।
আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন,
কাঁপাইয়া ধরাতল, বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল সে ভীমরব ফাটিল গগন।
সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ, কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।
খেলিছে বিদ্যুৎ, একি ধাঁধিয়া নয়ন!
লাখে লাখে তরবার, ঘুরিতেছে অনিবার্য্য
রবি করে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।
ছুটিল একটী গোলা রক্তিম বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে, সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মীর-মদন পতন।
"হুররে হুররে" করি গর্জ্জিল ইংরাজ,
নবাবের সৈন্যগণ, ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পালাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।
"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ, যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহন লাল "নিকট সমন।
"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির, কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।
"ভারতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম,
নবাবের মাথা খেয়ে, কেমনে আসিলি ধেয়ে,

মরিবি মরিবি ওরে যবন সন্তান।
"সেনাপতি! ছি ছি! একি! হা ধিক্ তোমারে!
কেমনে বলনা হায়! কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে!
"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ, দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ পয়োধির?
"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার,
যায় বঙ্গ সিংহাসন, যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর?
"ভেবেছ কি স্বধু রণে করি পরাজয়,
রণমত্ত শত্রুগণ, ফিরে যাবে ত্যজি বন,
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়?
"মূর্খ তুমি!—মাটি কাটি লভি কহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায়! কে ঘরে ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?
"কিম্বা যেই পাশে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দু জাতি দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্ত কাল বুঝি এই উপস্থিত।
"সামান্য বণিক এই শত্রুগণ নয়,
দেখিবে তাদের হায়! রাজ্য রাজ্য ব্যবসায়
বিপণি সমরক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।
"নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব শৃঙ্খল ভার, ঘুচিবেনা জন্মে আর,
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়।

যেই হিন্দু জাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দু জাতি সনে, নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।
"অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ, নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার।
"সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত, করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর!
"এক দিন—এক দিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন, যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহি যেন নর-গৃধিনীর করে।
"হারাস্ নে, হারাস্ নে, রে মূর্খ যবন!
হারাস্ নে এ রতন, এই অপার্থিব ধন,
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন।
"বীর প্রসবিনী যত মোগল-রমণী
না বুঝিনু কি প্রকারে, প্রসবিল কুলাঙ্গারে,
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখন।
"প্রণয় কুসুম-হার রে ভীরু দুর্ব্বল!
পরাইলি যে গলায়, বলনা রে কি লজ্জায়,
পরাইবে সে গলায় দাসত্ব শৃঙ্খল?
"চির-উপার্জ্জিত সেই কুলের গৌরব,
কেমনে সে পূর্ণ শশী, কলঙ্কে করিলি মসি!
ততোধিক যবনের কি আছে বিভব?
"ভুবন বিখ্যাত সেই যশের কারণ,

বনিতা দুহিতা তরে, লও অসি লও করে
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ।
"কোথায় ক্ষত্রিয়গণ সমরে শমন,
ছিছি ছিছি একি কাজ, ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ,
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন?
"বীরের সন্তান তোরা বীর অবতার;
স্বকুলে দিলিরে ঢালি, এমন কলঙ্ককালী,
শৃগালের কাজ, হয়ে সিংহের কুমার?
"কেমনে যাবিরে ফিরে ক্ষত্রিয়-সমাজে,
কেমনে দেখাবি মুখ, জীবনে কি আছে সুখ,
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে।
"ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায়;
সে বীরত্ব প্রভাকরে, অর্পি ভীরু! রাহু করে
কেমনে ফিরিবি ঘরে কি ছার আশায়?
"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান;
রাখিব রাখিব মান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ!
"চল তবে ভ্রাতাগণ চল পুনর্ব্বার,
দেখিব ইংরাজদল, শ্বেত অঙ্গে কত বল,
আর্য্য-সুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার?
"বীর প্রসূতির পুত্র আমরা সকল;
না ছাড়িব এক জন, কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেত অঙ্গে রক্ত-স্রোত না হ'লে অচল।
"দেখাব ভারত-বীর্য্য দেখাব কেমন;
বলে যদি হিমাচল, করে তারা রসাতল,

না পারিবে টলাইতে একটী চরণ।
"যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে,
ডুবায় সিন্ধুর জলে, তথাপি ক্ষত্রিয় দলে,
টলাইতে না পারিবে, বলে কি কৌশলে।
"সহে না বিলম্ব আর চল ভ্রাতাগণ,
চল সবে রণস্থলে, দেখিব কে জিনে বলে
ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পণ!"
ছুটিল ক্ষত্রিয় দল, ফিরিল যবন,
যেমতি জলধি জলে, প্রকাণ্ড তরঙ্গ দলে,
ছুটি যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন!
বাজিল তুমুল যুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন, ধূম অগ্নি উদ্গীরণ,
জলদের মধ্যে যেন অশনি-সম্পাত।
নাচিছে অদৃষ্টদেবী, নির্দ্দয় হৃদয়,
এই ব্রিটিসের পক্ষে, এই বিপক্ষের বক্ষে,
এইবার ইংরাজের হলো পরাজয়।
অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ, কর অস্ত্র সম্বরণ,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"
উত্থিত কৃপাণ-কর হইল অচল,
সম্মুখ চরণদ্বয়, পবনে উত্থিত রয়,
দাঁড়াল নবাব সৈন্য হইল চঞ্চল।
যেমতি শিখর-ত্যাগি পার্ব্বতীয় নদী,
করি তরু উন্মূলন, ছাড়ি গুল্ম লতা বন,
অবরুদ্ধ হয় শৈলে অর্দ্ধ পথে যদি।

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ,
যদি কোন মতে তারে, বারেক টলাতে পারে,
উড়াইয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।
তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ সঙ্গিন করে, ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।
কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়,
লাগিল সঙ্গিন যায়, বরিষার ফোটা প্রায়
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিস বাজনা,
কাঁপাইল রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্ত কায়, অস্ত গেলা রবি হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।—পলাশীর যুদ্ধ।

দশরথের পুত্রেষ্টি যাগ।

অপুত্র দশরথ পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সুরসমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায়, আরক্তলোচন, রক্তাম্বরধারী, দিবাকরের ন্যায় আকার, মহাবীর্য্য মহাবল এক মহাপুরুষ

তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত রজতময় আচ্ছাদনযুক্ত দিব্য পায়স-পূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ঐ পুরুষের কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, কলেবর সিংহের ন্যায় লোমশ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজালে বিরাজিত, কেশ অতি সুচিক্কণ, সর্ব্বাঙ্গ দিব্যাভরণে বিভূষিত ও শুভলক্ষণযুক্ত। তিনি শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত এবং প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় করাল-দর্শন। এই দিব্য-পুরুষ গর্ব্বিত শার্দূলের ন্যায় মন্থরগমনে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দশরথের প্রতি নেত্র-নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। দশরথ এই কথা শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তখন সেই প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত প্রশস্ত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যদর্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই দেবান্ন-পূর্ণ দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিদ্রের অর্থলাভের ন্যায় এই দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই অপূর্ব্বকায় প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম কুতূহলে তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তেজঃ-

পুঞ্জ বলেবর প্রাজাপত্য পুরুষও স্বকর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

মনোহর শারদীয় শশধরের করনিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায়, সেই রূপ রাজা দশরথের অন্তঃপুরবাসী রমণী-গণের হর্ষোৎফুল্ল মুখকমল সুশোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন, তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্দ্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহা-রও অর্দ্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এই রূপে রাজা দশরথ সহধর্ম্মিণীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ-প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা পায়সান্ন প্রাপ্ত হইয়া নৃপতির ঈদৃশ অনুগ্রহপাতে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নী-দিগকে অন্তর্বত্নী দেখিয়া সুর সিদ্ধ ও ঋষিগণ পূজিত ইন্দ্রের ন্যায় হৃষ্টচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।—হেমচন্দ্রের রামায়ণ।

জীবন মরীচিকা।

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।
হবে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে?

প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ, ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আকারে।
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী ললাম ভূত নিত্য সুখে পরিপ্লুত"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদায় সুধাময় সংসারে।
মধ্যাহ্ন তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ না থাকে কুসুম গন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোগত সাধ যত ভাঙ্গে চিত্তবিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা, লয়ে সৌদামিনী ডালা
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে।

পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে,
জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসী মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতা রে!
ধর্ম্মনিষ্ঠা পরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন,
বিমল স্বভাব যুবা এবে বল কোথা রে।
অসত্য কলুষ লেশ, পশিলে শ্রবণ দেশ
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার
জ্বলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে?
কোথা সে দয়ার্দ্র চিত্ত, সংকল্প যাহার নিত্য
পরদুঃখ বিমোচন এ দুরন্ত সংসারে?
অত্যাচার উৎপীড়ন করিবারে সংঘটন,
না করিত যেই জন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোষামোদ
সে তেজস্বী মহোদয় বল এবে কোথা রে?
কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভারে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ স্থাপিবে মঙ্গল ঘট
প্রণত ধরণীতল দিবে দিবা পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য,
হয়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরা রে।
স্বদেশ হিতৈষী কেহ ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতীয় উদ্ধারে।

কার চিত্তে অভিলাস, হবে সারদার দাস
পিবে সুখে চিরদিন অমরতা সুধারে।
কালের করাল স্রোতে ভাসে হবে জীবনেতে
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে!
কিশোর গাণ্ডীবধারী যামদগ্ন্য দৈত্যহারী
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে দিবা নিশি কেহ কাঁদে
বিষম বৈধব্যদশা নিগড়েতে বাঁধা বে।
দারুণ অপত্য তাপে দেখগে কেহ বিলাপে
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদরে।
আগে যদি জানিতাম পৃথিবী এমন ধাম
তা হলে কি পড়িতাম আলয়ের মাঝারে।
কোথা গেল সে প্রণয় বাল্য কালে মধুময়
যে সখ্যতা পাশে মন বাঁধা ছিল সদারে?
সহপাঠী কেশিচর অভেদাত্মা হরিহর
এবে তাহাদের সঙ্গে কত বার দেখা রে।
পতঙ্গ পালের মত কর্ম্ম দোষে অবিরত
স্বকার্য্য সাধনে রত কেবা ভাবে কাহারে।
তাহা পুনঃ কত জন করিয়াছে পলায়ন
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন নক্ষত্রবৎ তাহারাই অকস্মাৎ
প্রকাশে ক্বচিত কভু মৃদু রশ্মি মাথারে।
আগে ছিল কত সাধ হেরিতে পূর্ণিমা চাঁদ
হেরিতে নক্ষত্র শোভা নীল নভঃ মাঝারে।

দিন দিন কত বার জাগ্রতে নিদ্রিতাকার,
স্বপ্নে স্বপ্নে ভ্রমিতাম নদ হ্রদ কান্তারে,
বসন্ত বরষা কালে পিকবর মেঘজালে
হেরিতে দামিনী লতা, কি আনন্দ আহারে।
সে সাধ তরঙ্গকুল এবে কোথা লুকাইল
কে ঘুচাল জীবনের হেন রম্য ধাঁধাঁরে।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন স্বর্গবাসী সিংহাসন
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধ চিতা অঙ্গারে। কবিতাবলী।

কৃত্তিবাস।

ভাষা রামায়ণের স্থানে স্থানে কৃত্তিবাস আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায়, যে, নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের একস্থানে মুরারি ওঝার নাতি বলিয়া কৃত্তিবাস আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিষবৈদ্য এবং ভূতপ্রেতাদির মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ওঝা কহে, কিন্তু মুরারি বোধ হয় সে রূপ ছিলেন না। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে অদ্যাপি ওঝা উপাধিবিশিষ্ট পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বাস করেন। বোধ হয় মুরারি সেইরূপ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুরারির বোধ হয় বিশেষরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তিও ছিল, নতুবা কৃত্তিবাস পিতার নাম উল্লেখ না করিয়া তাঁহার নামে আত্মপরিচয় দিবেন কেন? কিন্তু উক্ত পরিচয় বাক্যে মুরারি ওঝা কৃত্তিবাসের পিতামহ কি মাতামহ

তাহা জানিতে পারা যায় না; কারণ এতদ্দেশে পৌত্র দৌহিত্র উভয়কেই নাতি বলা ব্যবহার আছে।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং কৃত্তিবাস ও তদীয় কীর্ত্তির কাল নির্ণয় নিতান্ত অনুমান-সাপেক্ষ।

রামায়ণ ও চণ্ডীকাব্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ ও তাহাদের রচনাবলী সমীচীনরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, উক্ত কাব্যদ্বয়ের জন্মকালের অন্তর অধিক বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণকে সমকালীন কবি বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়াও বোধ হয় না। উভয়ে এক সময়ে গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর না হইলেও ইহা নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে যে, যখন ফুলিয়া গ্রামে বসিয়া কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনাদ্বারা কীর্ত্তি বিস্তারের আয়োজন করিতেছিলেন, হয় ত, তখন চণ্ডীকাব্যকার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়, গুল্মাবৃত বিষধরের ন্যায়, সাগরোদরশায়ী রত্নের ন্যায় এবং কাননস্থিত সুরভি কুসুমের ন্যায় সাধারণের অলক্ষ্য থাকিয়া বালস্বভাব-সুলভ ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করিতেছিলেন। ভাষা পর্য্যালোচনা দ্বারা অনেকে এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, চণ্ডীকাব্যের প্রায় ৩০। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভাষারামায়ণ রচিত হইয়াছে। তদনুসারে অনায়াসে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভাষা রামায়ণের বয়ঃক্রম প্রায় ৩০০ বৎসর অতীত হইতে চলিল, সুতরাং কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। যে

সময়ে মহাত্মা আকবর ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন ও সুপ্রণালী সিদ্ধ রাজকার্য্য দ্বারা প্রজারঞ্জন করত দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহারই অধিকার মধ্য-স্থিত অতি ক্ষুদ্র গ্রামে কৃত্তিবাস বর্ত্তমান থাকিয়া কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন।

সকল ভাষারই প্রথম রচিত গ্রন্থসমূহে কোন প্রকার রচনাকৌশল বা বাগাড়ম্বর দৃষ্ট হয় না। যখন কোন ভাষার প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন উহার শব্দসম্পত্তির প্রাচুর্য্য বা প্রকৃতি প্রত্যয়াদির সুনিয়ম দৃষ্ট হয় না, সুতরাং পদ-বিন্যাসেরও পারিপাট্য হইতে পারে না। কৃত্তিবাসের সময়েও বঙ্গভাষার সেই প্রকার অবস্থা। সেই সময়ে পদ্য-রচনা-প্রণালী সুন্দররূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই, মিত্রাক্ষরের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ ছিল না, মাত্রাও একপ্রকার কবিদিগের ইচ্ছানুগামিনী ছিল, অক্ষরের ন্যূনাধিক্য প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যাইত। কৃত্তিবাস এবম্বিধ অসদ্ভাবের সময়েও যে বৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত পূর্ব্বে মূল রামায়ণ অবলম্বন করিয়া কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রঘুবংশ মহাকাব্য রচনাদ্বারা কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; ভবভূতি বীরচরিত ও উত্তরচরিত নামক বীর ও করুণরস পূর্ণ নাটকদ্বয় রচনা দ্বারা মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন; ভট্ট কবি ভট্টিকাব্য রচনা করিয়াছেন; এবং অধুনাতন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে অনেকেই যে মূল

রামায়ণরূপ কাব্যোদ্যান হইতে কুসুমচয়ন পূর্ব্বক বিবিধ প্রবন্ধমালা গ্রথিত করিয়া কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছেন, অদ্য প্রায় ৩০০ বর্ষ অতীত হইল, কৃত্তিবাস বাঙ্গালা ছন্দে সেই রামায়ণ রচনা করিয়া অসংস্কৃতজ্ঞ জনসাধারণের অসাধারণ উপকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। আরও প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি সংস্কৃত জানিতেন না। তিনি স্বপ্রণীত ভাষা রামায়ণ মধ্যে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, সংস্কৃত রামায়ণের মর্ম্মমাত্র শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালা পদ্যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন, কৃত্তিবাসের ঐ কথা গর্ব্বসূচক মাত্র অর্থাৎ মূলগ্রন্থের মর্ম্মশ্রবণ করিয়া এই বৃহৎ গ্রন্থের রচনা করা অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যের কার্য্য বলিয়া কবি গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহার অনুমোদন করি না। মূল ও ভাষা রামায়ণের পরস্পর অনৈক্য দেখিয়া কোন্ সহৃদয় পাঠক কৃত্তিবাসের সংস্কৃতজ্ঞতার পক্ষপাতী হইতে পারেন?

ভাষা রামায়ণের রচনা অতি সরল ও মধুর, কোন স্থানেই দুর্ব্বোধ ও জটিলভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলের সহিত ঐক্য নাই, এবং স্থানে স্থানে কবির স্বকপোল কল্পিত বর্ণনা আছে, তাহা বলিয়াই যে ভাষা রামায়ণে কোন সারবৎ কথা নাই, এমন নহে। উহাতে অনেক নীতিগর্ভ কথা দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাস এই স্বরচিত বৃহৎ গ্রন্থমধ্যে সরল ও সহজভাবে তৎকাল-প্রচলিত মিত্রাক্ষর ও যতি মাত্রাদির নিয়ম বজায় রাখিয়া যেরূপ সুমধুর রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির

বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা রামায়ণ মধ্যে স্থানে স্থানে শব্দ চাতুর্য্য ও পরিহাস রসিকতার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ভাষার শৈশবাবস্থায় যাঁহার লেখনী হইতে এরূপ মনোমুগ্ধকর মধুর রচনা বিনির্গত হইয়াছে, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি স্বপ্রণীত কাব্যের স্থানে স্থানে আত্মশ্লাঘা ও কবিত্বাভিমান প্রকাশদ্বারা সুকুমারচেতা কবিজনের প্রকৃত ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। ভণিতার অনেক স্থানেই "আমি কবি, আমি পণ্ডিত, আমার কণ্ঠে ভারতী বিরাজিতা" ইত্যাদি গর্ব্ব-সূচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক,—কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনাদ্বারা কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন, একাল পর্য্যন্ত কত গায়ক, কত মুদ্রাকর ও কত লেখক তদ্দ্বারা ধন মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, ই . কবির সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণের প্রকৃত প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। যে সকল মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্ট হয়, তাহার একখানিও পরিশুদ্ধ নহে। ক্রমে এমে তাহা এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যে মূলের সহিত মিলাইলে অনেক অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

রামায়ণ ভিন্ন কৃত্তিবাসের আরও দুই খানি গ্রন্থ আছে; একখানির নাম "যোগাধ্যার বন্দনা," আর একখানির নাম "শিবরামের যুদ্ধ।" দুই খানিতেই কৃত্তিবাসের নামে ভণিতা আছে, রচনাও তাঁহারই বলিয়া বোধ হয়।

কে বলিতে পারে ?

মানুষের অদৃষ্টের বিষম দুর্গমে
প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পারে
বিপদ ভুজঙ্গপ্রায়, গরলমণ্ডিত কায়,
গরজিয়া আসিতেছে হায়! অভাগারে
দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে ?

কিম্বা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-সুন্দরী
সাজিয়া মোহিনী সাজে ফুলমালা করে,
আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনক মুকুট শিরে,
বরিতে আদরে বরে যথা স্বয়ম্বরে
গলাজে কুসুম হারে নারী কুলেশ্বরী।

কে বলিতে পারে এই জীবন-সাগরে,
কখন্ উঠিবে ঝড় ভীম দুর্নিবার ;
বিপদ নীলোর্ম্মিকুল, কাঁপাইয়া উপকূল,
উঠিবে গগনপথে ; ভেদি পারাবার,
মগনিবে দেহতরী জলধি অন্তরে ?

অথবা কখন্ পূর্ণ সৌভাগ্যের শশী
বিরাজিবে উজ্জলিয়া জলধি-হৃদয়,
চন্দ্রের কিরণতলে, হাসিবে তরঙ্গ-দলে,
চুম্বিয়া শতেক চন্দ্র-মুখ সুধাময়—
বিনাশিবে দুঃখতম হৃদয়েতে পশি ?

পাঠক!—
আজি তুমি অবনীর রাজ রাজেশ্বর,
আসীন হীরকময় স্বর্ণ সিংহাসনে,
ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্য অভাব সনে,
হবে না সাক্ষাৎ তব এ মর জীবনে.
—প্রণয়, বিষয় সুখে প্রফুল্ল অন্তর—
জানিলাম মূঢ় তুমি আমার মতন
কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে? সম্পদে, সংসারে।
এই স্তূপাকার প্রায়, একটী তরঙ্গ যায়,
কোথায় হইবে লয় কে বলিতে পারে?
রাজার ভবন হবে বিজন কানন।
কিম্বা যদি নিরাশ্রয়, দীন অসহায়,
কেন কাঁদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনীরে?
এই চিন্তা-বিষধরী, এই দুঃখ-বিভাবরী,
কত দিন রবে আর পোহাবে অচিরে;
দিবেন সুদিন, যিনি দিলেন আমায়।-অবকাশরঞ্জিনী

রোমীয় রাজপদ।

রোম নগরে রাজনিয়োগ বিষয়ক যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় প্রধান প্রাড়্‌বিবাক অপেক্ষা রোমীয় রাজার অধিক ক্ষমতা ছিল না। রাজার যে সকল ক্ষমতা ছিল, তিনি তৎসমুদায় প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। পৃথিবীর যাবৎ লোক যদি সচ্চরিত্র হয় তাহা

হইলে রাজা ও রাজকীয় ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সমুদায় লোক সৎ ও সৎপথাবলম্বী নহে। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দুষ্টলোকেরা শিষ্টলোকের উপর অনায়াসে অত্যাচার ও বলপ্রকাশ করে। প্রজাগণ পরস্পর সেই অত্যাচার নিবারণে উদ্যত হইলে মহতী অনর্থ পরম্পরা এবং দেশমধ্যে ভূয়সী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত প্রজাগণ ঐক্য বাক্যে কোন প্রধানতম ব্যক্তির উপর আপনাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে আপনাদের সমুদায় ক্ষমতা অর্পণ করে। এইরূপে প্রথমে রাজপদের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে ঐ পদ কোন কোন দেশে অতিশয় পূজ্য হইয়া উঠিয়াছে; এবং প্রথমে যে যুক্তিতে রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছিল, সে যুক্তি ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহাতে সেই সেই দেশের লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, সমুদায়ই রাজার; প্রজাগণ যাহা কিছু ভোগ করে, তৎসমুদায় রাজপ্রসাদলব্ধ। সুতরাং রাজাও তত্তদ্দেশে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। কিন্তু রোমকেরা রাজাকে সেরূপ জ্ঞান না করিয়া আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বিবেচনা করিত এবং রাজা উপরত হইলে স্বদত্ত সমুদায় ক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করিত।

রোমের রাজা পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে প্রজাগণের নিকট হইতে রাজশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সংগ্রামস্থলে প্রধান সেনাপতির, ব্যবহার দর্শনকালে প্রধান প্রাড়্বিবাকের এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।—রোমরাজ্যের ইতিহাস।

ভাগীরথী নীরে সীতার দেহত্যাগ।

ওরে বনচর! সর্ সর্ সবে,
রুধো না, রুধো না, রুধো না পথ ;
রবে না জনকী আর এই ভবে,
চলিল চলিল অন্ধের মত।

রঘুকুলদেবী ভাগীরথী-কোলে,
রঘুকুলবধূ জানকী আজ,
শরণ লয়েছে দুখে ঝাঁপ জলে,
কাঁদিবে না আর কানন মাঝ।

ধেয়ে যেতে কেন বন লতাবলী,
ধরিতেছে মম চরণ বেড়ে,
দিও না কো বাধা সবিনয়ে বলি,
দাও দাও দাও দাও না ছেড়ে।

পতিসুখী হবে ভাবি এই মনে,
ছেড়ো সীতা আগে অনন্তপ্রাণ ;
মরণে তিলেক বিলম্ব এখন,
করে সে নিরয়-যাতনা জ্ঞান।

করি সন্ সন্ কেন বন-বায়ু
প্রতিকূলে গতি কর হে রোধ ?
অভাগীর গেছে ফুরাইয়ে আয়ু,
এটা কি তোমার নাই হে বোধ ?

পতি-প্রীতে যেই হুতাশন-মুখে,
দিয়েছিল প্রাণ আহুতি-দান,
ভাগীরথী-নীরে আজো মনোসুখে,
পতি-প্রীতে সেই সঁপিবে প্রাণ !

সদাগতি ! গতি কর কর তথা
প্রিয়পতি মম যথায় আছে,
এই অভাগীর গোটা কত কথা
বিনয়ে জানাও তাঁহার কাছে ।

কহিও "রাঘব ! তব প্রেমাধিনী
তুমি যারে সদা সাদর-ভাষে
সম্বোধিতে বলি প্রাণ স্বরূপিনী
সাদরে স্থাপিয়ে হৃদয় বাসে .

তোমার বিরহ-ভয়ে সে কখন
ধরে নাই হৃদে মুকুতা হার
তোমাতে অর্পিত যার প্রাণ মন,
একমাত্র তুমি আরাধ্য যার ;

তব প্রীতে যেই পাতি পৃষ্ঠদেশ
সহিয়াছে রক্ষ-চেড়ীর বাড়ী ;
অণুমাত্র মনে গণে নাই ক্লেশ
ভুলেছে সকল নিশ্বাস ছাড়ি ;

সতীত্বের সাক্ষ্য রাখি হুতাশনে,
দিলে যে অভাগী সবার মাঝে ,

যার সতীত্বের সাক্ষ্য দেবগণে
দিয়াছেন আসি নর-সমাজে,

অধিক কি ? যারে বিনা অপরাধে
দোহদের ছলে পাঠায়ে বনে,
সাধিলে হে বাদ সব সুখ সাধে
তারে কি তোমার পড়ে না মনে ?

তব উপেক্ষায় জনম-দুঃখিনী
সেই সীতা মনে পাইয়ে তাপ ;
ত্যজি অবিচার-ভরা এ মেদিনী
ভাগীরথী নীরে দিয়েছে ঝাঁপ ;

সে অনুতাপিনী মরণ সময়
কিছুই কামনা করেনি আর,
জন্ম জন্ম যেন রাম স্বামী হয়
চরমেও এই কামনা তার।

মহিষী তোমার হইতে সে আর
করে না করে না করে না সাধ ;
মিটেছে মিটেছে মিটেছে তাহার
জনমের মত সে সুখসাধ।

জন্ম জন্মান্তরে এই আশা করে
বিধাতার কাছে কেঁদে সে এবে ;
যেন দাসীভাবে পূর্ণ ভক্তি ভরে
তব পদ-যুগ সতত সেবে।

সীতার কথায় সহসা প্রত্যয়
যদি না জনমে, দাঁড়াও তবে,
স্বচক্ষে নিরখি যাও সমুদায়
যা দেখিবে তাই তাঁহারে কবে।

অভাগিনী মেয়ে দুখ তাপে জ্বলে
জুড়াতে না পেয়ে কোথাও স্থান,
বসে স্নেহবতী জননীর কোলে
জুড়ায় যেমন তাপিত প্রাণ!

আমি সেই মত দুখে তাপে জ্বলে
ভাগরথী জলে দিতেছি ঝাঁপ;
রঘুকুল দেবী রাখিবেন কোলে
যদি মোর কিছু না থাকে পাপ।"

বলিতে বলিতে রাম-বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে
হইলেন গঙ্গা-সলিল-শায়িনী
জননীর কোলে ঘুমালো মেয়ে।

রাঘবের প্রেম-সুখ নিধি ভরা
সুবর্ণ-তরণী ডুবিল জলে;
নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা
বিষম বিষাদে পাষাণ গলে।

আর কি এ তরী ভাসিয়ে উঠিবে,
আর কি এ তরী লাগিবে কূলে?

হেন শুভ দিন আর কি হইবে
বিধি কি সদয় হইবে ভুয়ো ?

রামের প্রেমের প্রতিমা খানিরে
গড়েছিলি কি রে দারুণ বিধি !
ডুবাইতে শেষে জাহ্নবীর নীরে
গেল না কি তোর ফাটিয়ে হৃদি ?

কোথা রাঘবেন্দ্র প্রেমিক উদার !
একবার হেথা দেখ সে এসে ;
হৃদয়-সরসী-সরোজী তোমার
ভাগীরথী নীরে যেতেছে ভেসে !

তোমার হৃদয়-উদ্যান শোভিনী
মুকুলিতা এই কণক লতা,
ভাসাইয়ে লয়ে যায় তরঙ্গিণী
জন্মে না কি তব মরমে ব্যথা !

হায় হায় হায় হায় কি হইল !
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
রঘুকুললক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কার অভিশাপে অতল তলে ?

নির্ব্বাসিতা সীতা" বিলাপ সঙ্গীত
গাইতে হরিশ পারে না আর ;
কল্পনার বীণা হইল স্থগিত,
সীতা শোকে তার ছিঁড়িল তার।—নির্ব্বাসিতা সীতা

সংস্কৃত ভাষা।

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অপূর্ব্ব ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দ ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারুরূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না। অতি প্রাচীনকাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

সংস্কৃতভাষায় দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে পূর্ব্ব, পর, অথবা উভয় বর্ণই প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপান্তর প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে সন্ধি বলে। সন্ধি প্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতা পরীহার ও সুশ্রাব্যতাসম্পাদন হইয়া থাকে। আর প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা অনেক পদকে, একত্র যোগ করিয়া, এক পদ করা যায়। এই অনেক পদের একপদীকরণ প্রণালীকে সমাস বলে। সমাস প্রক্রিয়া দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও সুশ্রাব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে সমাসঘটিত বাক্য সরল অপেক্ষাকৃত দুরূহ এবং আবৃত্তিমাত্র তত্তদ্বাক্যের অর্থবোধ

নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। সমাস প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘপদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যেরা সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস করিয়া থাকেন। কোন কোন উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থেও বিংশতি পদ পর্য্যন্তও একপদীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদ-সাধন ও প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সংকলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ কি ললিত কি উদ্ধত, সর্ব্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সংস্কৃতভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আদি কালাবধি ঐ দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেন; তদনুসারে, সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দ বিদ্যানুশীলন প্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃতভাষী লোকেরা, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। সেই প্রদেশ ইরান। তাঁহাদিগের গবেষণাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অতি পূর্ব্বকালে, ইরা-

নের আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মানি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। ইঁহারা ইবানে অবস্থানকালে একজাতি ও একভাষাভাষী ছিলেন। ঐ একজাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন। এবং ঐ এক ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্ম্মনিতে জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহাদিগের পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এ সকল যে এক মূল ভাষার পরিণাম বিশেষ-মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে ঐ সমস্ত বিষয় উহাতে সংক্ষেপেও সুচারুরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; এই নিমিত্ত কলিতার্থমাত্র উল্লিখিত হইল।—সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

স্বভাবের শোভা।

একদা নিদাঘ কালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল ভনু গ্রীষ্ম নিরদয়।

হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর সেবনে,
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল সুখ সিন্ধু-জলে মন,
উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সমান,
কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জনস্থান,
নির্ব্বাত তড়াগসম হয়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগভীর শান্ত দরশন।
তরুপরে ঝিল্লি সুধু ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
সুধার সুধারা ঢালে শ্রবণ বিবরে।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতি বদন ভরা হাস!
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।
টুপ টুপ পড়িছে শিশির বিন্দুচয়,
প্রকৃতির সুখ-অশ্রু অনুভূত হয়।
চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে
সমুজ্জল অগণন তারকা সঙ্কাশে,
যেন নীল চন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে!
অনন্তর প্রমোদ অন্তরে, ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে।
বিকসিত কামিনী কুসুম তরুতলে,
বসিলাম চিন্তা-সখী সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়নরঞ্জিনী

নিরমল নীরময়ী মৃদুলগামিনী ;
মন্দ মন্দ বায়ু ভরে মন্দ মন্দ হেলে ;
বিধুর উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে।
কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল,
কিছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল !
আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানা জাতি তরুদলে শোভে দুই কূল।
শশিকরে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে!হায় !
কোথায় মাধবী সহ জড়িত হইয়া
সহকার নদী'পরে পড়েছে বাঁকিয়া,
যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে
মুখ দেখে কান্তাকান্ত পুলকিত মনে।
কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,
কোথাও তেঁতুল ডাল হেলিয়া রয়েছে,
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে, সমীরণ ভরে।
সারি সারি তরণী দুধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আবোরিয়া সুখে নিদ্রা যায় ;
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।

এইরূপে প্রকৃতির রূপ দরশনে
আহা ! কি নির্মল সুখ উপজিল মনে।
শিহরিল কলেবর, পুলকে পূরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল।

মনেমনে কহিলাম, "অয়ি সুপ্রকৃতে
শোভনে, বিচিত্র চারু ভূষণে ভূষিতে!
মরি মরি কিবা তব মোহিনী মূরতি!
নিরখি নয়নে হ'ল জড় প্রায় মতি।
অপরূপ তবরূপ একরূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময়।
যখন প্রাবৃট্ কালে জলদের দল,
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগন মণ্ডল,
ঝম্ ঝম্ রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীমরবে গরজে গভীর,
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে,
কদম্ব কেতকী আদি কুসুম নিকরে,
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে;
তখন তোমার চারু রূপ দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে?
সুখময় ঋতু-নাথ বসন্ত যখন,
নব পরিচ্ছদে কর চারু আচ্ছাদন;
ফুল্ল ফুল দূর্ব্বাদল চারু আভরণে
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্য বদনে,
বিহঙ্গ নিনাদ ছলে গাও সুললিত;
তখন না হয় কার মানস মোহিত?
এইরূপ যে সময় যেই রূপ ধর
তাতেই তখন ভব-জন-মন হর।
সাধে কি গো কত মহা মহা কাব্যকর

উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর,
গভীর অরণ্যে ঘন শ্যামল প্রান্তরে
ভীষণ বিজন গিরি গহ্বরে গহ্বরে,
হেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন
অনুক্ষণ সকলেতে করেন ভ্রমণ!
সাধে কি গো! কবিদের সফল নয়ন
তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা-সমূহ সুশোভন।
সামান্য তরুর পাতা করি দরশন,
মুহুর্মুহু পুলকাশ্রু করে বরিষণ।
ধিক্ সে মনুষ্যগণে! ধিক্ ধিক্ ধিক্!
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা মানে অধিক;
হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যগ্রচিত্তে ধায়,
তোমার সৌন্দর্য্য পানে ফিরিয়া না চায়।
কৃত্রিম কুসুম দেখে প্রসক্ত হৃদয়,
স্বভাবজ বনফুলে অনুরক্ত নয়।
মনুষ্য নির্ম্মিত বদ্ধ হর্ম্যের ভিতরে
বদ্ধ থাকে চিরকাল প্রফুল্ল অন্তরে।
উদ্যান বিপিন গিরি করিয়া ভ্রমণ
তোমার বিচিত্র রূপ হেরে না কখন।
বনবাসী বিহঙ্গের মধুময় গান,
শ্রবণ করিয়া কভু না জুড়ায় প্রাণ।
বিফল তাদের জন্ম, বিফল জীবন,
বিমল আনন্দ তারা না জানে কেমন!
ধন্য ধন্য! সেই সুচতুর শিল্পকর!
যে রচিল তোমার এ তনু মনোহর।

বিচিত্র কৌশল তাঁর, অনন্ত শকতি !
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি।
বলগো শোভনে অয়ি প্রকৃতি সুন্দরি !
কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরী ?
কোথা সেই রচয়িতা সর্ব্বগুণাধার ?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর ?"—স, শ।

মহারাজ দিলীপের শততম অশ্বমেধ।

মহারাজ দিলীপ উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় কতিপয় রাজপুত্র এবং সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আপন পুত্রকে হোম-তুরঙ্গম রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিলেন। পরিশেষে শততম অশ্বমেধার্থে অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। অশ্ব অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, রক্ষকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র তিরস্করণী বিদ্যার প্রভাবে লোক লোচনের অগোচর কলেবর ধারণ পূর্ব্বক রক্ষকদিগের সম্মুখ হইতেই অশ্বটী অপহরণ করিলেন। কে অপহরণ করিল, কোথায় বা লইয়া গেল, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কুমার-সৈন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। ইতি মধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনী যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার পিতার নিকট নন্দিনীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসে ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষে তাঁহার অঙ্গ নিঃসৃত জলে স্বীয় নেত্রদ্বয় ধৌত করিবামাত্র দেবগবীর মহিমায় তাঁহার দিব্য চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। তথায় রাজকুমার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বদিকে দেখিলেন এক ব্যক্তি

রথরজ্জুতে বন্ধন পূর্ব্বক অশ্বটি লইয়া যাইতেছে। তাহার সারথি অপহৃত অশ্বের চপলতা নিবারণার্থে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিতেছে। তদীয় রথ হরিত বর্ণ ঘোটকে সংযোজিত এবং তাঁহার অনিমিষ সহস্রলোচন অবলোকন করিয়া রাজপুত্র অশ্বাপহারীকে দেবরাজ বলিয়া স্থির করিলেন। পরে গগনস্পর্শী গভীর স্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! এ কি? শাস্ত্রকারেরা আপনাকে যজ্ঞভাগের অগ্রণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অথচ আপনিই যজ্ঞকর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! কি আশ্চর্য্য! আপনি কোথায় বিঘ্নকারীদের প্রতীকার করিবেন, না হইয়া স্বয়ংই বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা আপনার অতিশয় অন্যায্য কর্ম্ম. অতএব অশ্বমেধের প্রধান অঙ্গ এই তুরঙ্গমটী ছাড়িয়া দিন। ভবাদৃশ লোকেরা সৎপথের প্রদর্শক হইয়া এইরূপ অসন্মার্গ অবলম্বন করিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম একবারেই উচ্ছন্ন হইবে।

দেবরাজ যুবরাজের এইরূপ প্রগল্ভবাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং সারথির প্রতি রথ নিবৃত্ত করিতে আদেশ দিয়া প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন, রাজপুত্র! যাহা বলিতেছ ইহা সত্য বটে; কিন্তু যশোধন ব্যক্তিদিগের যশোরক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তোমার পিতা আমার জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তি লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পুরুষোত্তম বলিলে যেমন বিষ্ণুমাত্রকে বুঝায়; এবং মহেশ্বর বলিলে যেমন শিবমাত্রকে বুঝায়; তেমনি শত-ক্রতু শব্দ উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইয়া থাকে, আমাদের এই শব্দত্রিতয় কদাচ দ্বিতীয়গামী নহে। দেখ,

তোমার পিতা একোনশত অশ্বমেধ করিয়াছেন; আর এক অশ্বমেধার্থে অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপন করিলেই তিনি শতক্রতু হইবেন সুতরাং আমার কীর্ত্তিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিতে হইবে। ইহা আমার অসহ্য, এই নিমিত্ত আমি তাঁহার হোমতুরঙ্গম হরণ করিয়াছি। ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না, নিবৃত্ত হও, বৃথা কেন চেষ্টা করিতেছ? সগর রাজার সন্তানেরা কপিল মহর্ষির নিকট অশ্ব আনিতে যাইয়া যেরূপ বিপদ্‌-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তুমিও কি সেইরূপ বিপদে পদার্পণ করিতে চাহ? এই বলিয়া ইন্দ্র ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর যুবরাজ নির্ভয়চিত্তে দেবরাজকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেবরাজ! যদি আপনি নিতান্তই অশ্ব পরিত্যাগ করিবেন না এই নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে অস্ত্রগ্রহণ করুন, রঘুকে পরাজয় না করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিবেন না। রঘু এই বলিয়া শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইন্দ্র বিমানা-রোহণে গগনমার্গে ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজপুত্র ঊর্দ্ধমুখে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভাকার এক শর নিক্ষেপ করিলেন। রঘুর অস্ত্র ইন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। ইন্দ্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক অমোঘাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রশর কুমারের বিশাল বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইয়া রহিল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, দেবরাজের শর সর্ব্বদা অসুরশোণিত পান করিয়া থাকে, কদাচ নররুধির পান করিতে পায় না, বুঝি সেই নিমিত্তই সাতিশয় সতৃষ্ণভাবে নর-শোণিত পান করিতেছে। রঘু সেই গুরুতর প্রহারব্যথা কিছুমাত্র গণনা

না করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গাধিপের, বাহুমূলে এক নিশিত সায়ক নিক্ষেপ করিলেন এবং অপর এক অস্ত্র দ্বারা তদীয় রথের ধ্বজচ্ছেদ করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে পুরন্দর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া রাজপুত্রের প্রতি শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দুইজনে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরস্পরেরই জয়ী হইবার ইচ্ছা। কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিতেছেন না। বীরদ্বয়ের উপর্য্যধো ভাবে অবস্থিতি প্রযুক্ত ইন্দ্র-সায়ক অধোমুখে আসিতেছে, রঘুর শর উর্দ্ধমুখে যাইতেছে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ তটস্থ হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের পক্ষযুক্ত সায়ক সমূহ অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন পক্ষধর বিষধর সকল অতিবেগে গগনমার্গে উড্ডীন হইতেছে। অনন্তর রাজ-পুত্র অর্দ্ধচন্দ্রমুখ বাণ দ্বারা ইন্দ্রের ধনুর্গুণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দেবরাজ ছিন্ন ধনুঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া রঘুর প্রতি স্বীয় বীর্য্যসর্ব্বস্বভূত অমোঘ বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত বজ্র প্রচণ্ড আলোকে দশ দিক্ আলোকময় করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দাড়ম্বরে রঘুর গাত্রে পতিত হইল; রঘু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রঘু মুহূর্ত্তমাত্রে উগ্রতর বজ্রাঘাতের ভয়ঙ্কর ব্যথা সংবরণ করিয়া পুনর্ব্বার উঠিলেন। তখন তাঁহার সৈনিকেরা বিষাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

রঘু পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হইলেন। দেবরাজ যুবরাজকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া এবং তাঁহার অলোক-সামান্য পরাক্রম অবলোকন করিয়া

সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং কহিলেন, রাজপুত্র! তোমার অলৌকিক বীর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম, আমার এই অমোঘ বজ্রাস্ত্রের আঘাত সহ্য করে এমত লোক ত্রিলোকে লক্ষিত হয় নাই। ইহা পর্ব্বতে পড়িলেও পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তোমার কি আশ্চর্য্য পরাক্রম! কি দৃঢ়তর কলেবর! তুমি অনায়াসেই ঈদৃশ অস্ত্রের প্রহার সহ্য করিলে! তোমার এই অসীম সারবত্তা সন্দর্শনে আমি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, এই অশ্ব ব্যতিরেকে আর যাহা চাহিবে তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।

রঘু এই কথা শুনিয়া তূণীরমুখ হইতে যে শর তুলিতে-ছিলেন তাহা পুনর্ব্বার তন্মধ্যে সংস্থাপন করিয়া দেবরাজকে নিবেদন করিলেন, ভগবন! যদি অশ্বকে নিতান্তই অমোচ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতা যাহাতে আরব্ধ যজ্ঞের ফলভাগী হন, এমত বর প্রদান করুন। আর আমি রক্ষণীয় বস্তু হারাইয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়াছি, পিতার নিকট এই বৃত্তান্ত স্বয়ং নিবেদন করিতে পারি না। অতএব যাহাতে আপনার কোন দূত যাইয়া সভাস্থ ভূপালকে এই কথা বলিয়া আইসে ইহাও করিতে হইবে, এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

দেবরাজ তথাস্তু বলিয়া রঘুর প্রার্থনায় সম্মতিপ্রকাশ পূর্ব্বক সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন, সারথি আজ্ঞা পাইয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। রঘুও স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা, রঘুর আগমনের পূর্ব্বেই, ইন্দ্র-সন্দেশহরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত

অবগত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি পুত্রকে রাজসভায় উপস্থিত দেখিয়া কুলিশব্রণাঙ্কিত তদীয় কলেবর হস্তপরামর্শ পূর্ব্বক যথেষ্ট অভিনন্দন করিলেন। এইরূপে দিলীপ রাজা শততম অশ্বমেধ বিধিপূর্ব্বক সমাপন না করিয়াও ইন্দ্রের বর প্রভাবে তাহার ফলভাগী হইলেন এবং স্বয়ং বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া রঘুকে অখণ্ড ভূমণ্ডলের শাসনভার সমর্পণ করিলেন। পরিশেষে তিনি বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক সস্ত্রীক তপোবনে যাইয়া জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিলেন।—রঘুবংশ।

ধনুর্ভঙ্গ।

ক্রমে ক্রমে পরাক্রম হত যত ভূপ,
বসিল সভায় আসি মলিন বিরূপ;
দেখিয়ে বিদেহ আর নারিল রহিতে,
সভা সম্বোধনে তবে লাগিল কহিতে:—
"দেশ দেশ হৈতে কত আগত নরেশ,
অসুর রাক্ষস বসি ধরি নরবেশ;
কুমারী আমারি হয় অতি রমণীয়,
হরধনু ভঙ্গ এই কীর্ত্তি কমনীয়;
পাইলে উভয়ে লাভ নাহি বোধ মনে,
ইহার রহস্য আমি বুঝিব কেমনে?
ভঙ্গ করা দূরে থাক্ কঠিন সে অতি,
স্থানান্তর করিবার নহিল শকতি?
বীরশূন্য ধরা যদি বুঝিতাম মনে,
নাহি করিতাম তবে এই ছার পণে।

কিসের কারণে আর বসিয়া এখানে ?
ফিরিয়া সকলে যাও আপনার স্থানে।
বুঝিলাম জানকীর যোগ্য বীর নাই,
কুমারী কুমারী রবে কি করিব ভাই।”
জনক বচন শুনি নর নারী সব,
একবারে করিয়া উঠিল হাহারব।
দেখিয়ে লক্ষ্মণ ক্রোধে না পারি রহিতে,
সভা বিদ্যমানে তবে লাগিল কহিতে।
প্রণতি করিয়া বীর রাঘব চরণে,
দাঁড়ায়ে বলেন রাগে লোহিত লোচনে ;—
“ রঘুবংশ চূড়ামণি বসি যেই স্থলে,
বীর হীন বসুন্ধরা কার সাধ্য বলে ?
দেখিতেছে রামচন্দ্র সভা বিদ্যমান,
তবু জনকের মনে নাহি হয় জ্ঞান !
আজ্ঞা কর রঘুকুল-পদ্ম দিনমণি,
কন্দুক্রীড়া করি আমি লইয়া অবনী।
মূলোৎপাটি করি ধরি সুমেরু ভূধরে,
জরাজীর্ণ হরধনু লক্ষ্য কেবা করে ?
অবলীলাক্রমে ইথে গুণ চড়াইয়া,
শত যোজনের পথ যাইব লইয়া,
কমলের নাল তুল্য করিব ভঞ্জন,
হে নাথ সহেনা আর জনক গঞ্জন।”
কোপ যুক্ত লক্ষ্মণের বচনের ভরে
কম্পিত হইল ক্ষিতি টলমল করে।
দেখি জনকের মনে জন্মিল বিস্ময়,

জানকীর হইল কিন্তু প্রফুল্ল হৃদয়।
আচার্য্য কৌশিক আর যত মুনিগণ,
শুনি লক্ষ্মণের কথা আনন্দিত মন।
ইঙ্গিত করেন রাম বসিতে লক্ষ্মণে,
বিশ্বামিত্র বলেন রাঘব সম্বোধনে।
"উঠ রাম বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
কর তাত জনকের বিবাদ ভঞ্জন।"
শুনি উঠিলেন বীর করি তাঁরে নতি,
ঠমকে চমকে যেন যুবা মৃগপতি।
উদিত উদয়গিরি রূপ মঞ্চপর,
রঘুকুল তরুণ অরুণ মনোহর,
সাধু সরসিজ বন হইল প্রকাশ,
লোকের নয়ন ভৃঙ্গ পরম উল্লাস,
নৃপতিগণের আশা নিশা বিনাশিল,
বচন নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভা হরি নিল,
লুকাইল পেচক কপট ভূপ আর,
চক্রবাক মুনি মনে আনন্দ অপার।
সবাকার অনুমতি লয়ে তার পর,
চলিলেন রাম যেন প্রমত্ত কুঞ্জর।
অনিমিষে কৌতুক দেখিছে সর্ব্বজন,
কিরূপে করেন রাম কোদণ্ড ভঞ্জন।
সীতাস্থানে এসেছিল সহচরী যত,
পরস্পর বলাবলি করে এই মত;
কেহ কহে-জনকে বলুক নহে কেহ,
আপনার প্রতিজ্ঞা ভূপতি ছেড়ে দেহ।

কেহ বলে বটে ঐ সামান্য আকার,
অতুল বিক্রম বল সাধ্য বলে কার!
কোথায় অগস্ত্য কোথা সিন্ধু ভয়ঙ্কর,
একই গণ্ডূষে গেল উদর ভিতর!
ক্ষুদ্র অবয়ব অতি দেখ দিবাকরে,
উদয়েতে অবনীর অন্ধকার হরে!
অক্ষর-নির্ম্মিত মন্ত্র লঘু অতিশয়,
দেবতা দানব যক্ষ বাধ্য তার হয়!
অতএব সকলে জানিবে মনে স্থির,
হরধনু ভঙ্গ করিবেন রঘুবীর।
শুনিয়া তাহার বাক্য সুখী রামাগণ,
সীতা কিন্তু মনে মনে করেন চিন্তন,
হে হর পার্ব্বতী, বিধি, হে গণনায়ক!
তোমরা সকলে হও কল্যাণ দায়ক।
কোথা বিরূপাক্ষ-ধনু কুলিশ কঠোর,
কোথা সুকুমার রাম নবীন কিশোর!
হীরা কি ভাঙ্গিতে পারে শিরীষ সুমন?
দয়া করি দেহ বিধি জনকে সুমন।
একবার সীতারে দেখেন রঘুপতি,
পুনর্ব্বার চাহিছেন ধনুকের প্রতি।
শিশুসাপে যথা দেখে বিনতাকুমার,
হরচাপে রাম হেরিছেন সে প্রকার।
চরণে চাপিয়া ধরা লক্ষ্মণ আপনি,
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন বীর চূড়ামণি।
দিগ্‌হস্তী সমস্ত থাকিবে সাবধান,

ভাঙ্গিবেন রাঘব হরের ধনুখান।
উপস্থিত অনেকের সংশয় কুজ্ঞান,
মূঢ়মতি ভূপতিগণের অভিমান।
পরশুরামের মন্দ গর্ব্ব অতিশয়,
সঙ্গিনীগণের চিন্তা জানকীর ভয়।
ইহারা সকলে যেন আরোহী যেমন,
শিবধনু জাহাজে করিল আরোহণ।
শ্রীরামের বাহুবল অকূল সাগরে,
পার হেতু সবে [illegible] আকিঞ্চন করে,
ভাঙ্গিলেন রাম [illegible] কোদণ্ড জলযান,
ডুবিয়া মরিল সব [illegible] বিদ্যমান।
দুই খণ্ড করি ধনু [illegible] ফেলিয়া,
হইল পরম সুখী [illegible] হেরিয়া।
নিরখিয়ে রাম [illegible] চন্দ্রোদয়,
কৌশিকের আনন্দ সাগর বৃদ্ধি হয়।
ভুবন ভরিল জয় [illegible] স্বরে,
স্বর্গ হৈতে দেব [illegible] বৃষ্টি করে।
ভেরী ঢোল দুন্দুভি সানাই বংশীরব,
সুমধুর স্বরে গায় [illegible]সব।
দেখি হরচাপভঙ্গ [illegible]গণ,
সেইমত সকলের হইল তখন।
দিনকর নিশাকর করিলে প্রচার,
প্রদীপের আলো [illegible] থাকে আর;
চাতকী পাইলে স্বাতি নক্ষত্রের জল,
হৃদয়েতে যেই মত হয় কুতূহল;

সেইরূপ সীতা অতি আনন্দিত মন,
রামরূপ নয়নে করেন নিরীক্ষণ।
রঘুবরে দেখিতেছে লক্ষ্মণ চাহিয়ে,
চকোর চাঁদেরে দেখি তুষ্ট যথা হিয়ে।
শতানন্দ আদেশ দিলেন সেইক্ষণে,
চলিলেন সীতা তবে রামের সদনে।—তু-রা।

সন্ধ্যাকাল।

এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। উষ্ণরশ্মি নিজ রশ্মির অসহ্য তেজেই যেন দগ্ধাঙ্গ হইয়া জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় অরুণবর্ণ ধারণ করিলেন। তিনি উদিত হইয়া অবধি সমস্ত দিন ত্রিজগৎকে যে সাতিশয় সন্তাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পাপেই যেন তেজোহীন হইয়া অধঃপতিত হইয়া গেলেন। এই সময়ে ভূমি ও অন্তরীক্ষ সমুদায় সিন্দূরবর্ণ হইয়া উঠিল, বিহগকুল ব্যাকুল হইয়া কলরব সহকারে নিজ নিজ কুলায়-নিলয়ে আগমন করিতে লাগিল, অধ্বনীনগণ অধ্বগমনে বিরত হইয়া সমীপাশ্রমেই আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল এবং ধেনুপালেরা ধেনুসকল লইয়া গ্রাম্যগীত গানকরত গ্রামাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই দিবাকররূপ প্রহরী গগনরূপ রথ্যা হইতে অপসৃত হইলে তিমিররূপ তস্করেরা তরু-কোটর, গৃহকোণ, কারাগার, কূপগর্ভ, গিরিগুহা প্রভৃতি নানা নিভৃত স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গমন করত দলবদ্ধ হইয়া একবারে জগন্মণ্ডল আক্রমণ করিল। তখন

বোধ হইতে লাগিল যেন গগন অঞ্জন বর্ষণ করিতেছে. অন্ধকার গাত্রে লিপ্ত হইতেছে, অন্তরীক্ষ ভূমির সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদায় দিক্ একত্র সংহত হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর একটী, দুইটী, তিনটী করিয়া অনেকগুলি তারা ক্রমে ক্রমে নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া নীলাংশুক-বিলম্বী হীরকমণির ন্যায় অল্প অল্প কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল। অতঃপর শশধর অম্বরপথে প্রকাশমান হইলেন। তখন পৃথিবী যেন দুগ্ধোদধির অভ্যন্তরে বিলীনা হইল, সকল পদার্থই যেন সুধালেপিত হইল, এবং স্থাবর জঙ্গম সকলই যেন হাস্য করিতে লাগিল। তৎকালে রাজভবন চন্দ্রালোক, রত্নালোক ও দীপালোকে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।—হেমাবতী।

সংসারবিরাগী যুবক।

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল,
রাঙা রবি-ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল,
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে পাখী করে গান,
লোহিতবরণ ভানু অস্তাচলে যান,
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা,
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা,
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন,
শীতল শরীর সেবি মলয় পবন।
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন,
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা এক দিন।
ললাটের আয়তন, সুচারু বরণ,

লোচনের আভা তার, মুখের কিরণ,
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়,
সুরপুর বাসী বলি মনে ভ্রম হয়।
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে.
পূর্ব্বকথা আলোচনা করিছে কাতরে।
একদৃষ্টে একদিকে রহি কতক্ষণ,
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন ;—
"দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার,
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার,
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার,
ব্যথিত হতেছে এত, দাহনে তাহার।
চারিদিকে এই সব জগতের শোভা,
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা।
এই যে অলক্তময় ভানুর মণ্ডল,
এই সব মেঘ যেন জলন্ত অনল,
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকর ছটা,
সোণার পাতায় যেন সিঁদূরের ঘটা,
এই শ্যাম দূর্ব্বাদল, এই নদীজল,
মণ্ডিত লোহিত রবি-কিরণে সকল ;
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়,
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়।
মনের আনন্দে সব পাখী করে গান,
জানায় জগত-জনে রবি অস্ত যান।
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভী ওই, পাইয়া গোধূলি,
যাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি,

কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন,
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত মন।
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল,
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল!
ত্যজি গৃহ-কারাগার এনু নদীতটে,
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে;
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়,
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়।
চিন্তা-বিষে মন যার জরে এক বার,
নিরুপায় সেই জন বুঝিলাম সার!

সার ভাবিয়াছি আমি নরক সংসার,
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার।
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা-অলঙ্কার,
দ্বেষ, পরহিংসা আর নৃশংস আচার,
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি বার বার,
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার,
নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত,
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত;
পরিপ্লুত বসুন্ধরা ঐই সব পাপে,
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে।"—চি-ত।



পৃথু-চরিত।

অনন্তর পৃথিবীপতি পৃথু* ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক নানাপ্রকার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। একদা প্রজাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। (প্রজাগণের অন্নাভাবের কারণ এই যে, যে সময়ে বেণের রাজ্যের অবসান হয়, তৎকালে পৃথিবী অরাজক হওয়াতে ধান্য, যব, গোধূম, মাষ, মুদ্গ প্রভৃতি সমুদায় ওষধি নষ্ট হইয়াছিল) প্রজাগণ আসিয়া নমস্কার করিলে রাজা তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নিবেদন করিল, রাজেন্দ্র! যে সময় অরাজক হইয়াছিল, সেই সময় ভগবতী বসুন্ধরা সমুদায় ওষধিই গ্রাস করিয়াছিলেন। নরনাথ! এক্ষণে সমুদায় প্রজা অন্নাভাবে বিনষ্ট হইতেছে। বিধাতা আপনাকেই আমাদের বৃত্তিদাতা অর্থাৎ জীবনোপায় বিধায়ক ও প্রজাপালক স্থির করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমরা ক্ষুধায় কাতর হইতেছি, আপনি আমাদের জীবন ধারণের নিমিত্ত ওষধি প্রদান করুন।

অনন্তর ভূপাল পৃথু কুপিত হইয়া পিনাক নামক দিব্য শরাসন ও দিব্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক বসুন্ধরার প্রতি

---

* ইনি বেণ রাজার পুত্র, ইঁহার নাম বৈণ্য। পূর্ব্বকালে এই বৈণ্য প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথুনামে বিখ্যাত হন।

ধাবমান হইলেন। বসুন্ধরাও তৎক্ষণাৎ গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তিনি পৃথুর ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকেই ধাবমানা হইলেন, কিন্তু সেই ভূতধারিণী দেবী, যেখানে যেখানে গমন করেন, সেই স্থানেই দেখেন যে পৃথু উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। অনন্তর বসুধা পৃথু-পরাক্রম পৃথুর তীক্ষ্ণ শর হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কম্পান্বিত কলেবরে তাঁহাকে কহিলেন, নরনাথ! তুমি আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছ, কিন্তু তুমি কি জান না যে স্ত্রীবধ করিলে মহাপাতক হয়?

পৃথু কহিলেন, দোষী এক ব্যক্তির বধ করিলে যদি বহুলোকের মঙ্গল হয়, তাহা হইলে সেই এক ব্যক্তির বধে পাপ না হইয়া বরঞ্চ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

পৃথিবী কহিলেন, নরনাথ! প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত যদি তুমি আমাকে বধ কর তাহা হইলে কে তোমার প্রজাদিগের আধার হইবে অর্থাৎ কে তোমার প্রজাবর্গকে ধারণ করিবে?

পৃথু কহিলেন, বসুন্ধরে! তুমি আমার শাসনের বহির্ভূত, এইজন্য আমি শরনিকর দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিয়া, স্বীয় যোগবলে এই সমুদায় প্রজাগণকে ধারণ করিব।

অনন্তর বসুধা সাতিশয় সাধ্বসযুক্তা হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে সেই প্রজাপতি পৃথুকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই সিদ্ধ হয়, অতএব

আমি তোমাকে একটী উপায় বলিয়া দিতেছি, অভি-রুচি হয় অবলম্বন কর। নরনাথ! আমি পূর্ব্বের সে সমুদায় ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি দুগ্ধরূপে সে সমুদায় প্রদান করিতে পারি। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত কাহাকেও আমার বৎস কল্পনা করিয়া দাও। তাহা হইলে আমি সেই বৎসে বৎসলা হইয়া ক্ষীররূপে সমুদায় ওষধিই ক্ষরণ করিব। বীর! এক্ষণে আমার সকল অংশই বন্ধুর আছে, অতএব তুমি যত্নবান্ হইয়া আমার সমুদায় উপরিভাগ সমতল কর। তাহা হইলে আমি সেই সমভূমিতে সর্ব্বত্র সমান ভাবে উত্তম উত্তম ওষধি ও বীজস্বরূপ ক্ষীর প্রকাশ করিব।

অনন্তর পৃথু ধনুঃকোটি দ্বারা শতসহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন। এই অবধিই সমুদায় পর্ব্বতশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ধরণীতল সাতিশয় বিষম ও বন্ধুর ছিল সুতরাং তৎকালে নগর ও গ্রাম সমুদায়ের রীতিমত বিভাগ ছিল না। পৃথুর রাজ্যাধিকারের পূর্ব্বে পৃথিবীর সর্ব্বত্র উন্নতানত থাকাতে তাদৃশ শস্য উৎপন্ন হইত না, রীতিমত কৃষিকার্য্য করিবারও উপায় ছিল না, বণিক্‌পথ না থাকাতে কোনরূপে বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া উঠিত না, রীতিমত গোরক্ষা করিবারও সুবিধা হইত না। অনন্তর যে অবধি রাজা পৃথু রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই অবধিই এই সমুদায় পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই অবধিই গ্রাম-নগর প্রভৃতি স্থাপনের সূত্রপাত হইয়া দিন দিন ক্রমশঃ

তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। অনন্তর নরপতি পৃথুর প্রযত্নে পৃথিবীর যে যে স্থান সমভূমি হইতে লাগিল, সেই স্থলেই তিনি প্রজাগণকে বাস করাইতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে প্রজাগণ ফলমূল আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিত। ঐ ফলমূলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, অতিকষ্টে অতি অল্পমাত্র সংগৃহীত হইত। পৃথুর রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে যখন পৃথিবীতে অরাজক হয়, তৎকালে ওষধি সকল নষ্ট হওয়াতে ঐ অপ্রযত্ন-সম্ভূত ফলমূলও এককালে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর পৃথিবীনাথ পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তেই পৃথিবী দোহনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবী হইতে নানাবিধ শস্য দোহন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ অদ্যাপি সেই পৃথুর উৎপাদিত শস্যে জীবন ধারণ করিতেছে। পৃথু, ভূতধারিণী ধরণীর প্রাণদান হেতু পিতাস্বরূপ ছিলেন, এই হেতু ইনি 'পৃথিবী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর দেবগণ, মুনিগণ, দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, পর্ব্বতগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ, যক্ষগণ, পিতৃগণ, তরুগণ ইহারা সকলেই অভিলষিত তত্তৎপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলষিত বস্তুস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। ইহাদের মধ্যে সকলেরই স্ব স্ব জাতীয় এক এক ব্যক্তি বৎস ও এক এক ব্যক্তি দোহনকারিস্বরূপ হইলেন। এই সেই পৃথিবী সামান্যা নহেন। ইনি সমুদায় লোকের মাতা, সমুদায় লোকের কর্ত্রী, সমুদায় লোকের আধার ও সমুদায় লোকের প্রতিপালনকর্ত্রী হইতেছেন। ইনি পূর্ব্বে বিষ্ণুর চরণতল হইতে উৎপন্না

হইয়াছিলেন। তেজস্বী মহীপাল পৃথু বেণ হইতে উৎপন্ন হইয়া এতদূর প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। ইনি প্রজারঞ্জন হেতু প্রথমতঃ রাজা বলিয়া বিখ্যাত হন। যে ব্যক্তি বেণতনয় পৃথুর এই জন্ম-বিবরণ কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাকে কোন পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে না।—বিষ্ণুপুরাণ।

পরিবর্ত্ত।

রজনীর পর দেখ দিবার উদয়,
যামিনী আগতা পুনঃ দিবা হলে লয়।
কৃষ্ণ পক্ষে দিন দিন ক্ষীণ শশধর,
শুক্লপক্ষে পুনঃ তার বাড়ে কলেবর।
এখন নিদাঘ-তাপে তাপিতা যে রসা,
রসপূর্ণ হবে ইহা আইলে বরষা;
আবার শরদ ঋতু হইলে আগত,
প্রাবৃষা পলাবে লয়ে দলবল যত;
ক্ষণপূর্ব্বে হাস্যমুখী ছিল যে প্রকৃতি,
ঝড়েতে উহার কত হতেছে বিকৃতি!
ক্ষণপরে পুনরায় করিবে ঈক্ষণ
মেঘমুক্ত স্মেরযুক্ত উহার বদন।
এইরূপ কালচক্রে ঘুরিছে সংসার—
প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্ত হাসি, হাহাকার!
উঠিতেছে যাহারা এখন ভাগ্যবলে,
দুরদৃষ্টে তারা পুনঃ নামিবে সকলে;
দুর্ভাগ্য তিমিরে যারা পতিত এখন,
অচিরে সেবিবে তারা সৌভাগ্য কিরণ।

ত্রিভুবন জয় করি, অমরে যখন
দাসকর্ম্মে নিযুক্ত করিল দশানন,
একথা কখন সে কি করিত বিশ্বাস—
বানরে বানরে তারে করিবে বিনাশ?
যে সময় ভরত, মারীচ-তপোবনে,
খেলা করে বেড়াইত কাননে কাননে,
শকুন্তলা-মনে আশা ছিল কি এমন,
পৃথিবীর অধিপতি হইবে নন্দন?
পরিবর্ত্তিময় এই সংসার জলধি,
ইহাতে জোয়ার ভাটা বহে নিরবধি!
অতএব বুধগণে করি মন স্থির
সম্পদে সুশীল হবে, বিপদে সুধীর।
কিবা দুঃখে, কিবা সুখে সন্তোষ যাহার,
মানুষ তাহারে বলি ; মানুষ কে আর?—বাক্যমঞ্জরি

যাহার কিছুই অভাব নাই তাহার অসুখ।

রাজকুমারের মানসিক রোগের হেতু জানিতে পারিয়া উপদেশদাতা তাহার প্রতীকার করিবার আশয়ে, সেই প্রাচীন শিক্ষক, পরদিন রাসেলাসের নিকটে গেলেন এবং বিনীতভাবে কথোপকথনের অবসর চাহিলেন। রাসেলাস অনেক কালাবধি জানিতেন, ঐ শিক্ষকের বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, নূতন কিছু উপদেশ দিতে অথবা শিখাইতে পারেন, তাঁহার আর এরূপ সংস্থান নাই, সুতরাং অবসর দানে অনিচ্ছুক হইয়া মনে মনে কহিলেন, কেন আমাকে বিরক্ত করে? নূতন ও অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া

যে সকল কথা ভাল লাগিয়াছিল, আবার ভুলিয়া গেলে ভাল লাগিতে পারে, তাহা কি আমাকে ভুলিতে দিবে না? এই ভাবিয়া তথা হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন এবং বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতিদিন যেরূপ চিন্তা করিতেন, সেইরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। চিন্তা গাঢ়রূপে মনোমধ্যে নিবিষ্ট না হইতেই, সহসা, পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন শিক্ষক দণ্ডায়মান, তখন অত্যন্ত বিরক্ত ও অধীর হইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাবিলেন যাহাকে পূর্ব্বে বিলক্ষণ সম্মান ও সমাদর করিয়াছি, এবং এখনও ভাল বাসিয়া থাকি, তাহাকে অপমানিত করা উচিত নয়। অনন্তর বৃদ্ধকে নিকটে আহ্বান করিলেন ও উভয়েই নদীর তীরে উপবিষ্ট হইলেন।

বৃদ্ধ এইরূপ আহ্বানে উৎসাহিত হইয়া রাজকুমারের মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "কুমার! তুমি কি নিমিত্ত প্রাসাদের সুখ সম্ভোগ ও আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থিতি কর ও লোকের সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া মৌনভাবে থাক?"

রাসেলাস কহিলেন, "আমি আমোদে পরিত্যাগ করি, কারণ আমোদে আর আমোদ পাই না। আমি সর্ব্বদা দুঃখিত থাকি এবং আত্মদুঃখে অন্যের সুখ-শশধর মলিন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া নির্জ্জনে যাই ও একাকী অবস্থিতি করি।" বৃদ্ধ কহিলেন, "রাজকুমার? সুখের প্রাসাদে দুঃখের কথা তুমিই এই প্রথম উল্লেখ করিলে। তুমি

যে দুঃখের কথা কহিতেছ তাহা অমূলক। আবিসিনিয়ার সম্রাট্ যত সুখ-সামগ্রী প্রদান করিতে পারেন, সমুদায় এখানে আছে। এখানে পরিশ্রম ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিতে হয় না, অথচ তাহার ফল পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া দেখ, এখানে কিছুরই অভাব নাই, যাহা চাও সমুদায় আছে। যদি প্রার্থনীয় বস্তুই না থাকিল তবে কিসের দুঃখ ?"

রাজকুমার কহিলেন, "প্রার্থনীয় বস্তু কিছু দেখিতে পাই না অথবা কি বস্তু প্রার্থনা করি তাহা জানি না বলিয়াই দুঃখিত আছি। যদি জানিতে পারি যে, এই বস্তু প্রার্থনীয়, তাহা হইলে, উহা পাইবার ইচ্ছা হইলে যত্ন করি। তখন আর দিনমণি আস্তে আস্তে অস্তাচলে গমন করিতেছেন বোধ হয় না এবং প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, কি করিব বলিয়া ভাবিতে হয় না। যখন আমি দেখি মেষশাবক ও ছাগশাবকগণ একটা আর একটার অনুবর্ত্তী হইতেছে, তখন মনে হয়, আমিও কোন বিষয়ের অনুসরণ করিলে সুখী হইব। কিন্তু সেইরূপ করিযা দেখি তাহাতেও সুখ নাই। সকল দিনই সমান ও সমুদায় মুহূর্ত্তই এক প্রকার বোধ হয়। বিশেষ এই, পূর্ব্ব দিন ও পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত অপেক্ষা পরদিন ও পর মুহূর্ত্ত অধিক ক্লেশকর ও দুঃসহ হইয়া উঠে। বাল্যকালে দিন সকল শীঘ্র শীঘ্র যাইত, সমুদায় বস্তুই নবীন ও অচিরজাত বোধ হইত, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বস্তু দেখিয়া আহ্লাদিত হইতাম। আপনি একজন বহুদর্শী বটেন, কি করিলে শীঘ্র শীঘ্র দিন যাইবে বলিয়া দেন। আমি অনেক সামগ্রী

ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে অভিলাষের নূতন সামগ্রী কিছু নির্দ্দেশ করুন।"

বৃদ্ধ নূতন রকম দুঃখের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; তথাপি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, "কুমার! যদি তুমি পৃথিবীর দুঃখ ও দুর্দ্দশা দেখিতে, তাহা হইলে আপনার বর্ত্তমান সুখ স্বচ্ছন্দকে দুর্লভ ও বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে সন্দেহ নাই।" রাজকুমার কহিলেন, "হাঁ, এক্ষণে অভিলাষের নূতন সামগ্রী পাইলাম, পৃথিবীর দুঃখ ও দুরবস্থা দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা দেখিলে বোধ হয় সুখী হইব। কারণ অন্যের দুঃখের সহিত তুলনা করিয়া না দেখিলে আপনার সুখ বুঝিতে পারা যায় না।"—রাসেলাস।

উমার বদনশোভা।

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা, কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে,
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
উমা বলে ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়া কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে?

আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়?
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে,
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়ে মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগত-জননী যার ঘরে,
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে।—কালীকীর্ত্তন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অধীন দামুন্যা গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে মুকুন্দরাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশীয় উপাধি মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী। দামুন্যা, সেলিমাবাদ নিবাসী গোপীনাথ নন্দীর জমীদারী; এই স্থানে তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের বসতি। মুকুন্দরামের পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয়চন্দ্র এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম কবিচন্দ্র। বোধ হয়, কবিচন্দ্র প্রকৃত নাম নহে, উপাধি মাত্র। কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জন প্রভৃতি উপাধি যেমন কবিত্বশক্তির পরিচায়ক, কবিচন্দ্র নামও ঐ প্রকার হইবে; কিন্তু কবিচন্দ্রের রচিত কোন কাব্য আমাদের চক্ষে পড়ে নাই; কেবল শিশু-

বোধক নামক পুস্তকে দাতাকর্ণ প্রবন্ধে কবিচন্দ্র বলিয়া ভণিতি আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম কোন্ বৎসর জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। চণ্ডীকাব্যের সূচনায় গ্রন্থোৎপত্তির যে বিবরণ বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা যে সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে তদ্বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।

মানসিংহের অধিকার সময়ে দুরাচার মামুদ সরিফ বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করে। তাহার এবম্বিধ শাসন সময়ে আমীনেরা পোনর কাঠায় কুড়া ধরিতে লাগিল, সরকার কালস্বরূপ হইয়া পতিত ভূমিকে কৃষ্ট ভূমি লিখিয়া অধিক পরিমাণে কর নির্দ্ধারিত করিতে লাগিল, পোদ্দার টাকা প্রতি আড়াই আনা ধরাট লইয়া প্রতিদিন এক পাই হিসাবে সুদ লইতে লাগিল, ডিহিদার টাকা দিলেও রোজসহী করিত না এবং ধান্যগবাদি বিক্রয় দ্বারা কর দিতে অভিলাষী হইলেও কেহ তাহা উচিত মূল্যে ক্রয় করিত না, প্রজাদের পলায়নের উপায় ছিল না, দ্বারে দ্বারে প্রহরী বসিয়া থাকিত ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারে প্রজাকুল ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অগত্যা টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রয় করিয়াও রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিল, জমিদার গোপীনাথ নন্দী বন্দী হইলেন। এই ঘোরতর বিপত্তির সময়ে মুকুন্দরাম চণ্ডীগড় বা চণ্ডীবাটী নিবাসী শ্রীমন্ত খাঁ ও গম্ভীর খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া দামুন্যা ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পুত্র-কলত্র-সহ

তিন দিবস যদুকুণ্ডের আলয়ে অবস্থিতি করিয়া জনৈক মত জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর যাত্রা করিলেন। গোড়াই নদী পার হইয়া প্রথমতঃ তেউটিয়া গ্রামে, পরে দারুকেশ্বর উত্তীর্ণ হইয়া বাতন-পর্ব্বত-প্রান্তে উপনীত হইলেন। গঙ্গাদাস নাম্না তত্রত্য জনৈক-অধিবাসী তাঁহার বিশেষ অনুকূল্য করিয়াছিলেন। তথা হইতে গোথড়া গ্রামে উপনীত হইয়া এক সরোবরে রুক্ষ স্নান এবং ইষ্টদেবতার পূজা করিলেন, সঙ্গে কিছুমাত্র খাদ্য সামগ্রী ছিল না, শিশুসন্তান ক্ষুধায় রোদন করিতে লাগিল। এদিকে পথ-শ্রান্তিবশতঃ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া মুকুন্দরাম সরসীতটে শষ্প-শয্যায় যেমন শয়ন করিলেন, অমনি শ্রান্তিহারিণী নিদ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিল। ইত্যবসরে শঙ্করমহিষী চণ্ডী আবির্ভূত হইয়া স্বপ্নাবেশে তাঁহাকে সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিলেন। মুকুন্দরাম নিদ্রাভঙ্গ হইলে পত্র ও মসী লইয়া কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহার যশঃ-প্রাসাদের সূত্রপাত। অনন্তর তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণ-ভূমি পরগণার মধ্যে আরড়া গ্রামে পালধী বংশীয় রাজা বাঁকুড়া রায় বা বাঁকুড়া দেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আত্মবিবরণ বর্ণনপূর্ব্বক স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। রাজা কবিতাশ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া তদীয় গুণের পুরস্কার স্বরূপ দশ আড়া ধান্য দান করিলেন এবং স্বীয়পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষকপদে নিয়োজিত করিলেন। মুকুন্দরাম এইরূপে রাজসন্নিধানে জীবিকাপ্রাপ্ত হইয়া পরিবার ভরণপোষণের চিন্তাজাল হইতে নির্মুক্ত হইলেন। রঘুনাথ

রায় স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহাকে সঙ্গীত রচনা করিতে অনুমতি করেন এবং তাঁহারই প্রবর্ত্তনানুসারে মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

কাব্যকারের উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, দুরাত্মা মামুদ সরিফের অত্যাচারিতায় মুকুন্দরাম দেশত্যাগী হন। কিন্তু কবি যে লিখিয়াছেন, রাজা মানসিংহের অধিকার সময়ে এই ঘটনা হইয়াছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত তাহার সম্যক সামঞ্জস্য হয় না। আকবরের রাজত্ব সময়ে মানসিংহ বঙ্গদেশের সুবেদারী পদে এবং সের খাঁ বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের শাসন সময়ে কুতব সুবেদারী পদে ও মামুদ সরিফ বর্দ্ধমানের শাসন কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিল। কবির এই ভ্রমটী শুদ্ধ তৎকালীন রাজকার্য্যের পরিবর্ত্তন বিষয়িণী অজ্ঞতা মাত্র।

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" ইত্যাদি যে শ্লোক চণ্ডীকাব্যে দৃষ্ট হয়, তদ্দারা অবগত হওয়া যায়, যে ১৪৬৬ শকে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্য সমাপন করিয়াছেন। ইতিহাসের সহিত ইহারও কোন মতে সামঞ্জস্য হয় না। এসম্বন্ধে অধিক তর্ক বিতর্ক না করিয়া চণ্ডীকাব্যের যে সময় নিঃসংশয়িত রূপে নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বিবৃত করা যাইতেছে। রাজা রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরা এক্ষণে আরড়া গ্রামের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী সেনাপতে গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের বংশাবলীর বিবরণ দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা রঘুনাথ রায় ১৫৭৩খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৩খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন।

সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ ৩০ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন; তদনুসারে চণ্ডীকাব্যের বয়ঃক্রম প্রায় ২৯০ বৎসর হইতেছে।

কবিকঙ্কণের শিবরাম ও মহেশ নামে দুই পুত্র ও চিত্ররেখা ও যশোদা নামে দুই কন্যা ছিলেন। মুকুন্দ-রামের বংশীয়েরা এক্ষণে দামুন্যার নিকটবর্ত্তী বৈনাম গ্রামে বাস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসা করিয়া থাকেন।

মুকুন্দরামের সময়েও বঙ্গ ভাষার কৌমারাবস্থা অতি-ক্রান্ত হয় নাই; কবিতা রচনার জন্য ইনি কৃত্তিবাস অপেক্ষা অধিক উপকরণ পান নাই। কবিকঙ্কণ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও কবিত্বগুণে কৃত্তিবাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই উভয়বিধ সম্পত্তির প্রভাবেই চণ্ডীকাব্য রামায়ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। বস্তুতঃ মুকুন্দ-রামের সময়েও পদ্য-রচনা-প্রণালীর পারিপাট্য হয় নাই, অক্ষর-সংখ্যার প্রতিও পদ্যের নির্ভর ছিল না। কবি-কঙ্কণের চণ্ডীকাব্য ছন্দোবন্ধ বিষয়ে ও প্রসাদগুণে পরবর্ত্তী কাব্যসমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও প্রকৃত কবিত্ব গুণে বাঙ্গলা কোন কাব্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহাকে "কবিতাপঙ্কজরবি" বলিয়া সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের সময়েও যতির প্রকৃত নিয়ম উদ্ভাবিত হয় নাই। বিরাম বিষয়ে চণ্ডীকাব্যের বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাক্যকার দুরান্বয় দোষ পরিহারে একান্ত যত্নবান ছিলেন বলিয়া তাঁহার কবিতা লোকের

হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, এবং উহা ওজোগুণে ও আন্তরিক প্রকৃত ভাব পরিস্ফুটনে সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছে। যদি কল্পন ও স্বভাবোক্তিই কবিতার প্রকৃত অবলম্বন হয়, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ বঙ্গীয় যাবতীয় কবির অগ্রগণ্য ছিলেন সন্দেহ নাই। ওজোগুণে ইনিই বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে প্রধান। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, শাপভ্রষ্ট নায়ক নায়িকার জন্ম বিবরণ, ব্যাধ বালকের সৌভাগ্য সঞ্চয়, ধনপতির উপাখ্যান প্রভৃতি চক্রবর্ত্তী কবির কল্পনা-প্রসূত। চণ্ডীকাব্য প্রণয়নের পূর্ব্বে কোন কবি কি সংস্কৃত কি বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাধনন্দন ও ধনপতির উপাখ্যান সদৃশ কোন প্রবন্ধ রচনা করিয়া যান নাই। কালীদহে কমলবিহারিণী কামিনীর করি-ভোজন ও উদ্গীরণ ব্যাপার কবিকঙ্কণের কবিকল্পনার একশেষ বলিতে হইবে এবং ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনায় স্বভাবোক্তির বিলক্ষণ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তিনি আপন সাময়িক আচার ব্যবহার বর্ণনস্থলে যে প্রকার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন কবি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন সুতরাং দারিদ্র্য দুঃখ বর্ণন সময়ে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। ফুল্লরার বারমাস বর্ণন, খুল্লনার ছাগচারণ, ধনপতির কারামোচন কালের আক্ষেপোক্তি প্রভৃতি বিষয় পাঠ কালে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। যে স্থানে যেরূপ বর্ণনা হওয়া উচিত, চণ্ডীকাব্যে প্রায়ই তাহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত গুণে কাব্যপ্রিয় সহৃদয় সমাজে চণ্ডীকাব্যের এত সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিকঙ্কণের রচনা অতি প্রগাঢ় ও সুমধুর হইলেও কৃত্তিবাসের রচনার ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নহে। ইহার স্থানে স্থানে এত অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার আছে, যে সেই সেই স্থলে অর্থবোধ হওয়া সহজ নহে। আর স্থানে স্থানে অনেক অনৈসর্গিক বর্ণনাও দৃষ্ট হয়।

চণ্ডীকাব্য শ্রব্য কাব্য, অদ্যাপি অনেক গায়ক সেই সকল কবিতা তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে গান করিয়া আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। যাঁহাদিগের রসময়ী লেখনী হইতে এরূপ সুন্দর কবিতামালা নির্গত হইয়াছে যে অদ্যাপি তাহা অনেকের জীবনোপায় হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের ন্যায় ভগ্যবান আর কে? তাঁহারা নশ্বর দেহ ধারণ করিয়াও অমরতা লাভ করিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের রচিত অপর কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুবোধক পুস্তকে গঙ্গাবন্দনায় তাঁহার নামে ভণিতি আছে দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহার রচিত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তৎকালে প্রচারিত ছিল, কালক্রমে সে সকল লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

দুর্য্যোধনপতনে গান্ধারীর বিলাপ।

পুত্র দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল,
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল।
পঞ্চপাণ্ডবেতে তাঁকে ধরিয়া তুলিল,
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল।
সম্বিত পাইয়া তবে গান্ধার-তনয়া,
কৃষ্ণকে বলিল অতি শোকাকুল হ'য়া।

"দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন,
সঙ্গেতে না দেখি কেন কর্ণ দুঃশাসন?
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার,
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনু-কুমার?
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়,
একেলা পড়িয়া কেন আমার তনয়?
কোথা সে কুণ্ডল, কোথা মণি-মুক্ত-স্রজ,
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া, কোথা রথধ্বজ?
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে ধায়,
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলাতে লুটায়!
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন,
হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ!
জাতি যূথী পুষ্প আর চম্প নাগেশ্বর,
রঞ্জন মালতী আর মল্লিকা সুন্দর,
এসকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া,
হেন তনু লোটে ধূলি দেখ না চাহিয়া!
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী,
লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি,
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন,
আহা মরি কোথা গেলে রাজা দুর্য্যোধন!
আলস্য ত্যজিয়া কেন না দেও উত্তর,
যুদ্ধ হেতু তোমাকে ডাকয়ে বৃকোদর।
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লও হাতে,
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমসেন সাতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকিছেন যুদ্ধের কারণ,

প্রত্যুত্তর নাহি কেন দেও দুর্য্যোধন ?”
এতবলি গান্ধারী হইল অচেতনা,
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করিল সান্ত্বনা।
“শোক না করিবে আর শুন কুরুরাণি,
সকল দৈবের ক্রিয়া জানহ আপনি।
দৈবের অধীন দেখ সকল সংসার,
কোন মতে অন্যের না আছে অধিকার।
দেব দ্বিজ গুরু দ্বেষ, সকল কুকর্ম্ম,
সে সব বর্জ্জনে দেবী জানিবেন ধর্ম্ম।
দুষ্কর্ম্ম সকল ত্যজি থাকিলে সুপথে,
ইহ সুখ ভোগ, অন্তে যায় সে স্বর্গেতে।
না জানিয়া কুকর্ম্ম করেছে সেই জন,
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন।
অহঙ্কারে অধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর,
অবশেষে কর্ম্ম তার ফলয়ে দুষ্কর।
না শুনে সুজন-বাক্য মত্ত অহঙ্কারে,
অবশেষে সেই জন যায় ছারখারে।
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্ম-গুণে,
শোক দূর কর দেবি কান্দ কি কারণে ?
শুভাশুভ কর্ম্ম যত বিধির ঘটন,
ভোগ বিনা ক্ষয় হয় শাস্ত্রের লিখন।
কালে আসি জন্মে প্রাণী কালেতেই মরে,
কালবশ এই সব জানাই তোমারে।
বিচার করিয়া দেখ শুন নৃপ-নারি,
অজ্ঞ লোকে বৃথা শোক করে না বিচারি।

না কর বেদনা মনে শুন নৃপজায়া,
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া।"
কাশীরাম দাসের সর্ব্বদা এই মন,
নিরবধি রচে মহাভারত কথন।—মহাভারত।

কাশীরাম দাস।

কাশীরাম স্বরচিত মহাভারতের মধ্যে যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তদনুসারে যতদূর নিরূপণ করা যাইতে পারে, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইল।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী। কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রামে। প্রিয়াকর দাসপুত্র সুধাকর নামে॥ তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥" "সেবি কৃষ্ণ পদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণ-পদে থাকে যেন মন।" "মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ। বিরচিল কাশী দাস দেবরাজানুজ॥" "কহে কাশীদাস গদাধর দাসানুজ।" "কাশীরাম দেবে করে পয়ারে রচনা।" ইত্যাদি।

উপরি উক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ইন্দ্রাণীর অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে প্রিয়াকর দেব বাস করিতেন; তাঁহার পুত্র সুধাকর দেব, সুধাকরের পুত্র কমলাকান্ত দেব, কমলাকান্তের চারি পুত্র,—প্রথম কৃষ্ণদাস, দ্বিতীয় দেবরাজ, তৃতীয় কাশীরাম এবং চতুর্থ গদাধর। ইঁহারা দেব পদবী বিশিষ্ট কায়স্থ ছিলেন। জেলা বর্দ্ধ-

মানের অন্তঃপাতী ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যে সিঙ্গি গ্রাম আছে। ঐ গ্রাম কাটোয়া হইতে অধিক দূরে নহে। যখন "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ" লেখা রহিয়াছে, তখন ইন্দ্রাণী পরগণা তাহার সন্দেহ নাই। আরও, ঐ স্থানে বার-দুয়ারি ঘাট, গণেশ মাহাতার ঘাট, প্রভৃতি গঙ্গার ধারে-ধারে বারটী ঘাট আছে, তাহাই উল্লেখ করিয়া কাশী-রাম 'দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী' লিখিয়াছেন। আর ঐ গ্রামে "কেশেপুকুর" নামে এক পুষ্করিণী আছে, তাহা কাশীরামের খনিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, "কাশীরাম মহাভারত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আদি, সভা ও বনপর্ব্ব এবং বিরা-টের কিয়দংশের রচনা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। যথা ; 'আদি সভা বন বিরাটের কত দূর। ইহা লিখি কাশী-দাস গেল স্বর্গপুর।' কাশীরাম অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার একমাত্র দুহিতা ছিল। জীবনাবসান সময়ে জামাতাকে প্রারব্ধ ভারতের পরিসমাপ্তির জন্য অনুরোধ করিয়া যান। তদীয় জামাতা সেই অনুরোধে ভারতের অবশিষ্ট ভাগের রচনা সমাপন করিয়া স্বীয় শ্বশুরের নামেই গ্রন্থ প্রচারিত করেন।" এই প্রবাদের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষীয় যুক্তিই পাওয়া যায়। প্রথম পক্ষীয়েরা কহেন, "এই প্রবা-দের যথার্থ্য পক্ষে একমাত্র মহাভারতই প্রমাণ। যে অংশ কাশীরামের রচিত, তাহা অপর অংশ অপেক্ষা প্রগাঢ় ও শব্দালঙ্কারে অলঙ্কৃত। যিনি কাশীরামের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া মহাভারতের রচনা সম্পূর্ণ করেন, তিনি তাঁহার ন্যায় কবিত্ব শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন না, সুতরাং প্রথম অংশের

রচনা অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্য সম্পন্ন ও কবিত্ব-কুসুমে সুশোভিত।” দ্বিতীয় পক্ষীয়েরা কহেন, “এই জনপ্রবাদ অমূলক; উহা কেবল মহাভারতের মাহাত্ম্য এবং অনুবাদকের গৌরব সূচক মাত্র। তাঁহারা আরও কহেন, যে যদিও আদি, সভা, বন ও বিরাটপর্ব্বের কিয়দংশের রচনা অন্যান্য অংশের রচনা অপেক্ষা প্রগাঢ় ও বিশুদ্ধ, কিন্তু বিরাটপর্ব্বের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলে উহা দুই ব্যক্তির লেখনী বিনির্গত বলিয়া কোন মতেই বোধ হয় না। মহাভারত অতি বিস্তৃত গ্রন্থ, অল্প সময়ে উহার পদ্যানুবাদ সম্পন্ন হয় নাই। বহুকাল ব্যাপিয়া যে প্রবন্ধ লিখিত হয়, তাহার আদ্যন্ত যে সমানরূপ বিশুদ্ধ ও দোষস্পর্শশূন্য হইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। অপিচ, যিনি কাশীরামের অনুরোধে মহাভারতের অধিকাংশের রচনা করিয়াছেন, তিনি কবিকীর্ত্তি লাভে এতাদৃশ নিস্পৃহ ছিলেন যে, স্বরচিত অংশ মধ্যে প্রসঙ্গত, ভঙ্গিক্রমে, কি কোন কৌশলে স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন নাই, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাঁহারা এই জনপ্রবাদ ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও সে ব্যক্তির কিছুমাত্র পরিচয় অবগত নহেন।”

এস্থলে উভয় পক্ষের অভিপ্রায় বিবৃত হইল। ফলতঃ আমরা অপর কোন ব্যক্তিকে কাশীরামের কবিকীর্ত্তির অংশ প্রদান করিতে অনভিলাষী বলিয়াই হউক, মহাভারতে দুই ব্যক্তির কবিত্বকুসুমের স্বতন্ত্র সৌরভ পাই নাই বলিয়াই হউক, অথবা কাশীরামের জামাতার কবিকীর্ত্তি লাভে নিতান্ত নিস্পৃহতায় অবিশ্বাস করিয়াই হউক, উক্ত জনপ্রবাদ সমূলক বলিয়াই প্রত্যয় করিতে পারি না।

অধিকন্তু এক্ষণে ঐ প্রবাদের একটী মূল পাওয়া যাইতেছে। সিঙ্গিগ্রামের অনেকের মুখে শুনা যায় যে কাশীরাম আদি সভা বন ও বিরাটপর্ব্বের কিয়দংশ লিখিয়া ৺ কাশীধামে গমন করেন। উক্তস্থান স্বর্গসদৃশ এই হেতুক ঐ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। ঐ পর্য্যন্ত রচনার পর তাহার মৃত্যু হয়, এরূপ অর্থ নহে। প্রবাদের অনুকূল পক্ষীয়েরা কহেন, কাশীরামের পুত্রসন্তান ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পুত্রসন্তান থাকার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কাশীরাম দাসের পুত্র আপন পুরোহিতকে এক বাস্তবাটী দান করিয়াছিলেন, তাহার দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। উহা ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত। যদি এই দানপত্র সত্য হয় তবে এতদ্দ্বারা কাশীরামের সময় নির্ণয় অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে। তাহা হইলে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ২০০ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে কাশীরাম বর্ত্তমান থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামের সময়ে মিত্রাক্ষর ও পদ্যের রীতির পারিপাট্য ছিল না, কাশীরামের সময়ে ক্রমে তাহার সুপ্রণালী সংস্থাপিত হইয়া আইসে। কাশীরাম মিত্রাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী, চতুরক্ষরী পদে পয়ার ত্রিপদী চতুষ্পদী প্রভৃতির সুন্দর রীতি প্রকাশ করিলেন। যে সময়ে রামায়ণ ও চণ্ডীকাব্য রচিত হয়, তখন বঙ্গভাষার অত্যন্ত হীনাবস্থা। সেই জন্যই কৃত্তিবাস রামায়ণগ্রন্থে তাদৃশ রচনাশক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; এবং কবিকঙ্কণও শব্দ-দরিদ্রতাবশতঃ স্থানে স্থানে গ্রাম্য শব্দ

প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। কাশীরামের সময়ে বঙ্গভাষা অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং শব্দ-সম্পত্তি-সম্পন্ন হইয়া মনোগত ভাব প্রকাশের উপযোগিনী হইয়াছিল। চণ্ডীকাব্যে ছন্দোগত যে সকল দোষ দৃষ্ট হয়, ভারতে তাহা অতি অল্প দেখা যায়। কবিকঙ্কণ যে ভাবটী প্রকাশ করিতে গিয়া শব্দাভাবে সম্যক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই, কাশীরাম সেই ভাবটী সুন্দর শব্দমালায় গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। কাশীরাম ভারত-রচনায় কবিত্বশক্তির প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। মহাভারতে নানারস বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থকার সেই সকল রস বর্ণনায় বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। বিবিধ গুণের একত্র সমাবেশজনিত মহাভারত বাঙ্গলা উৎকৃষ্ট কাব্যের মধ্যে পরিগণিত তাহার সন্দেহ নাই। আরও এক কথা এই যে, কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না; তিনি স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে কথকের মুখে শুনিয়া এই সুবিস্তীর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন। যথা, "শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার। অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার ॥" কিন্তু তথাপি তাঁহার রচনা অসংস্কৃতজ্ঞের রচনার ন্যায় বোধ হয় না। স্থানে স্থানে কবি স্বকপোল-কল্পিত উপন্যাস বিন্যাস করিয়াছেন, তথাপি অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে এককালে অসংখ্য বিষয়ের উপদেশ পাওয়া যায়। এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিতে যে সময় ব্যয়িত হয়, সারগ্রাহিতা থাকিলে তাহার সহস্রগুণ ফললাভ হয় সন্দেহ নাই।

কাশীরামের একটী মহৎগুণ এস্থলে বিবৃত করা যাই-

তেছে। তিনি যে অতি বিনীত ছিলেন, মহাভারতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি দীনভাবে কাশীরাম ভণিতা প্রদান করিয়াছেন, কোন স্থলেই শ্লাঘা বা গর্ব্বসূচক শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কাশীরাম অত্যন্ত কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন, বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি স্বরচিত গ্রন্থমধ্যে বারংবার ভারতের মহিমাদ্যোতক পদবিন্যাস করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারত পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন গ্রন্থকার কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে উহার রচনা করিয়াছেন, কবিত্ব প্রকাশ অথবা কবি-কীর্ত্তি স্থাপন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

কাশীরামের প্রণীত অপর কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।

সময়।

সময় নামেতে ক্ষেত্র অতি চমৎকার,
যত্নবলে রত্ন ফলে তাহে অনিবার।
আলস্য-গিরিতে তাহা রুদ্ধ স্থানে স্থানে;
উৎপাত-নদীর পাতে ভগ্ন কোন খানে;
নিদ্রা বনে কোন স্থানে ঘোর অন্ধকার,
অকর্ম্মণ্য মরুভূমি কত আছে তার;
তথাপি যে কিছু আছে অবশিষ্ট ভাগ,
তাহার বর্দ্ধনে যদি কর অনুরাগ,
অবশ্য পাইবে ফল আশা অনুরূপ,
চরমে তাহাই হবে মঙ্গল-স্বরূপ।

বিনা অবধানে যত গত হয় কাল,
ক্রমে গণি দেখ শেষে তাহাই বিশাল।
অনাদি অনন্ত কাল কোথা কত যায়,
গণিয়া তাহার সীমা বল কেবা পায়?
নদীর প্রবাহ সম অবিরত গতি,
কাহারো প্রতীক্ষা হেতু না করে বিরতি।
কালরূপ চক্রে বদ্ধ থাকি নিরন্তর
অবিরত ভ্রমে দিনকর নিশাকর,
বার, পক্ষ, তিথি মাস, যার আজ্ঞামত,
গতাযাত করিতেছে সবে রীতিমত।
যার প্রহরীর ভাব ঋতুগণ ধরে,
আবির্ভাব তিরোভাব যথাকালে করে।
এই সবে সাক্ষ্য দেয় কালের মহিমা
কিন্তু কার সাধ্য করে সে গতির সীমা?
জগতের শুভ হেতু তারা সমুদয়,
কালের গতির মাত্র দেয় পরিচয়।
কালেতে উৎপন্ন হয়, কালে হয় লয়,
কালে অন্ত করে বলি কালান্তক কয়।
কালেতে যে কিছু কর থাকে মাত্র তাই,
কালকৃত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই।
কালের প্রখর স্রোতে কেবা থাকে স্থির,
কীর্ত্তি শৈল থাকে মাত্র অটল শরীর।
বিক্রম-আদিত্য কোন্ কালে অস্তগত,
অদ্যাপি সকলে গায় তাঁর যশ কত!
কোথা বা সে রামচন্দ্র, কোথা যুধিষ্ঠির,

অদ্যাপি যাঁদের কীর্ত্তি ভূষণ মহীর!
কোথা বা গৌতম, মনু, বাল্মীকি কোথায়,
যাঁহাদের কীর্ত্তিনাশে কাল ক্ষোভ পায়!
নিউটন্, মিল্‌টন্, কোথা কলম্বস,
কালে কি হরিতে পারে তাঁহাদের যশ?
কালেতে ভৌতিক দেহ করিয়াছে নাশ,
কবিদের কীর্ত্তিদেহ আছে সুপ্রকাশ।
এ সংসারে স্থির কীর্ত্তি চিরশোভা পায়,
কালের কঠোর কর পরশে কি তায়?
অতএব বৃথা কাল হর কেন সবে,
যে কিছু করিবে তাই পরকালে রবে।
অনন্যাতুষ্কর শুভ কর্ম্ম যদি কর,
সেই তব কীর্ত্তিস্তম্ভ রবে নিরন্তর।
কালে গেলে কলেবর কালের কবলে,
জগতে জীবিত রবে তবু কীর্ত্তি-বলে।
কেহ কেহ সময়েরে করি অবহেলা,
দুঃখের সঙ্গেতে রঙ্গে চির করে খেলা।
সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে যিনি অবহিত,
সময় অভাবে তিনি না হন তাপিত।
নিয়মে নিষ্পন্ন হয় সব কাজ তাঁর,
আলস্যের তাঁর প্রতি নাহি অধিকার।
আলস্য-শত্রুকে যার হয় মিত্র বোধ,
তাহার দুঃখের দ্বার কেবা করে রোধ?
সময় কেমন্ ধন তারা নাহি গণে,
পরিশেষে পরিতাপ করে মনে মনে।

বৃথা কর্ম্মে কর যদি সদা কাল ক্ষেপ,
চরমে করিবে তবে বড়ই আক্ষেপ।
অনর্থ সময় যাহা এড়াইয়া যায়,
সহস্র সুবর্ণে সে কি আসে পুনরায়?
বর্ত্তমান ছাড়ি ভবিষ্যতে যার ভর,
তাহার অশেষ ক্লেশ হয় নিরন্তর।
অদ্য কল্য দুই তুল্য কর যদি বোধ,
কেবা জানে পরদিনে কত প্রতিরোধ?
অস্তগত কাল বৃথা অস্ত হয় যার,
ভবিষ্যতে তাহার কি আছে অধিকার?
ঈশ্বরের ন্যস্ত ধন সময় রতন,
তার আয় ব্যয় স্থিত না রাখে যে জন,
সেই অবিশ্বাসী শেষে পাইবে বিষাদ,
হিসাবের দিনে বড় ঘটিবে প্রমাদ।
যে করে পরের ধন স্বেচ্ছামতে ক্ষয়,
তাহার উচিত শাস্তি যথাকালে হয়।
যে সময় পাইয়াছ তাহা ধর আয়,
ব্যয় তার অকারণে বৃথা যাহা যায়।
ভাল কাজে যাহা যায় তাহা মাত্র স্থিত,
দিনান্তে এরূপ নিত্য গণনা উচিত।
এই রূপ দিন দিন বৃথা ব্যয় ধর,
অবশ্য স্থিতের ভাগ হবে লঘুতর।
অতএব শিশুগণ কর মনোযোগ,
উচিত রূপেতে কর সময় সম্ভোগ;
নিরূপিত কালে নিজ নিত্য কর্ম্ম যত,

সমাধান কর যদি হবে রীতি মত।
এই উপদেশ যার মনে নাহি ধরে,
চিরদিন সেই দীন সময়ের তরে।
উত্তম বিষয়ে যদি কাল গত হয়,
স্মরণের যোগ্য তাই জানিবে নিশ্চয়।— নী, পু।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলে রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন ও পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদের বর্ণনানুসারে রামরামের কবিত্ব শক্তি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু তৎপ্রণীত কোন গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। বোধ হয়, পদাবলী ও গীত রচনায় তাঁহার ক্ষমতা ছিল, সেই জন্যই রামপ্রসাদ তাঁহাকে কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামরাম সেনের দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষে নিধিরাম নামে এক পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষে চারি সন্তান; জ্যেষ্ঠা দুই কন্যার নাম অম্বিকা ও ভবানী, রামপ্রসাদ তৃতীয় সন্তান, কনিষ্ঠের নাম বিশ্বনাথ। রামপ্রসাদের রামদুলাল নামক এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা।

রামপ্রসাদের প্রণীত তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুকীর্ত্তন পাঠ করিলে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অতি সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ঐ বংশের ধনাধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। তথাপি রাম-

রাম সেন এরূপ নিঃস্ব ছিলেন না যে, শিক্ষাভাবে পুত্রগণ চিরদিন মূর্খ হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ সেন সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ১৬৪০। ৪৫ শকে তাঁহার জন্ম বলিয়া বোধ হয়; কারণ তাঁহার গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে রচিত হইয়াছে। অতএব রামপ্রসাদের জন্ম সময় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সংসার-ভারগ্রস্ত হইলে কলিকাতা বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন ধনবানের সংসারে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃতি সিদ্ধ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবলতাবশতঃ তাঁহার মন বিষয় বাসনায় নিতান্ত উদাসীন ছিল। সংসার নির্ব্বাহের উপায়ান্তর থাকিলে তিনি কখনই পরাধীনতা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু তাহার এই পরাধীনতাই ভবিষ্যৎ খ্যাতি প্রতিপত্তির নিদান হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ যে খাতায় হিসাব লিখিতেন, তাহার লিখনাবশিষ্ট ভাগ বৃথা না রাখিয়া দুর্গানাম ও শক্তি-ভক্তি রসাভিষিক্ত পদাবলী লিখিয়া পরিপূর্ণ করিতেন। হঠাৎ সেইগুলি প্রধান কর্ম্মচারীর নেত্রপথে পতিত হইলে, তিনি যার পর নাই ক্রোধ-পরবশ হইয়া প্রভুসমীপে রামপ্রসাদের প্রতি-কূলে নানাবিধ দোষারোপ করতঃ তাঁহাকে খাতা প্রদর্শন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ধনস্বামী স্বীয় প্রধান কর্ম্মচারীর ন্যায় গুণবিমূঢ় ছিলেন না, তিনি অভিনিবিষ্ট চিত্তে খাতা

খানির আদ্যোপান্ত দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে "আমায় দেও মা তবিলদারী" প্রভৃতি কতিপয় গীত তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। তিনি ঐ গীত-নিচয়ের রসভাব মাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া রচয়িতা রামপ্রসাদের উপরে নিতান্ত ভক্তি-পরবশ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সাংসারিক অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামপ্রসাদ স্বীয় সাংসারিক দুরবস্থার কথা নিবেদন করিলে তিনি ঔদার্য্যগুণে করুণাপূর্ণ ভাবে রামপ্রসাদকে কহিলেন,—"আপনার আর অনিত্য সংসারচিন্তায় অনবরত ব্যাকুল হইবার কোন প্রয়োজন নাই, আমি আপনাকে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব, তল্লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে দিনপাত করুন। আপনার অবলম্বিত পদবীতে পদার্পণ করা মানবজীবনের একান্ত প্রার্থনীয়, তৎপথ হইতে আপনাকে বিরত করা আমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।" প্রভুর এতাদৃশ কারুণ্য ও সৌজন্যপূর্ণ সৎব্যবহারে প্রীত হইয়া রামপ্রসাদ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সংসারচিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া পরমেশ্বর-চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রভুর নিকট যাবজ্জীবন নিয়মিত রূপে মাসিক ত্রিংশৎ মুদ্রা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের জীবনবৃত্ত মধ্যে এই ঘটনাটী পাঠ করিলে মনে কি এক চমৎকার ভাবের উদয় হয়! যদি ধনস্বামী তাঁহার প্রতি গুণবিমূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তবে কবির পরিণাম কি হইত? হয় ত এতাদৃশ জীবন কেবল দুঃখভার বহনেই অতিবাহিত হইত এবং তাঁহার রস-

ভাবময়ী লেখনী হয়ত কেবল খাতা লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। গুণগ্রাহী প্রভুর সামাজিকতা ও দানশীলতা গুণে তাঁহার মন চিরদিনের মত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে রামপ্রসাদ কেবল শক্তিসংকীর্ত্তন ও রচনাংমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার আয় বৃদ্ধির আরও একটী উপায় হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী পদাবলী শ্রবণে সকলেই বিমোহিত হইতে লাগিল। যাহাদিগের কীর্ত্তনাদি কোন গীতের প্রয়োজন হইত, তাহারা সকলেই তাঁহার নিকট রচনা করিয়া লইত এবং কালীর ও কবির প্রণামীস্বরূপ নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিত। এক্ষণে তাঁহার যে প্রকার আয় হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি অর্থপ্রিয় হইলে সংসারের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও অনায়াসে বিপুল ধনসঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তাঁহার হাতে কিছু থাকিলে সম্মুখে দানোচিত পাত্র উপস্থিত দেখিলেই তাহাকে যথাসাধ্য দান করিতেন।

কখন কখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বায়ুসেবনার্থ কুমারহট্টে আসিয়া বাস করিতেন। একদা মহারাজ রামপ্রসাদের গুণ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বানকরত তাঁহার শক্তি-ভক্তি, নিষ্কাম-চিত্ততা, উদার-প্রকৃতি ও কবিত্বশক্তি সন্দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন, এবং তাঁহাকে রাজধানী লইয়া গিয়া রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত একত্র প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বাধীনচিত্ত রামপ্রসাদ স্বভাবতঃ নিষ্কাম-প্রকৃতি ছিলেন, সুতরাং কিছুতেই তিনি লোভাকৃষ্ট হইলেন না। কাব্য-

প্রির গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিলেন, অধিকন্তু কবির উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ১১৬৫ সালে ১৪ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। তাহার সনন্দে এরূপ লিখিত আছে "গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।"

রামপ্রসাদ রাজদত্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার গৌরব রক্ষার নিমিত্ত এই সময়ে বিদ্যাসুন্দর নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার "কবিরঞ্জন" নাম প্রদান করিলেন।

কুমারহট্টে আজু গোঁসাই নামে একব্যক্তি বাস করিতেন। এরূপ কিংবদন্তী, যে তিনি উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার যে দ্রুত রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, উৎসাহ পাইলে তিনিও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ যে কোন পদাবলী পাঠ করিতেন, আজু গোঁসাই পরিহাস-রসিকতার সহিত তৎক্ষণাৎ-বিরচিত শ্লোক দ্বারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেন, তজ্জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কথন কখন উভয়কে একত্র করিয়া সেই আমোদ দেখিতেন।

যদিও কবিরঞ্জনের স্বর সমধিক সুললিত ছিল না, তথাপি স্বরচিত পদাবলী সংগীত বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। জনশ্রুতি আছে, রামপ্রসাদ একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুরশিদাবাদ গিয়াছিলেন, এবং তথায় ভাগীরথীবক্ষে নৌকামধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে দুর্দ্দান্ত নবাব সেরাজউদ্দৌলাও নৌকা করিয়া

নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। এমত সময়ে রামপ্রসাদের গান শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় তরণীতে আনাইয়া গান করিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দি গান আরম্ভ করেন, তাহাতে নবাব বিরক্ত হইয়া, রাজার নৌকায় যেরূপ গান হইতেছিল, সেইরূপ গান করিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ এরূপ চমৎকারিতার সহিত শক্তিগুণ গান করিয়াছিলেন, যে তাঁহার করুণস্বরে ও ভাব-ভঙ্গীতে নবাবেরও পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, বাহুল্যভয়ে সেগুলির অবতারণা করিলাম না। তাঁহার পরলোক যাত্রার বিষয় সাতিশয় বিস্ময়কর। শ্যামাপূজার পর দিন রামপ্রসাদ আপন পরিবারদিগকে আপনার আসন্নকাল জানাইয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ে প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া চারিটী গীত ক্রমান্বয়ে গান করিয়া গতাসু হইলেন।

কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অঙ্কে পরিবর্দ্ধিত হইয়া 'ভারতচন্দ্র ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, দুরদৃষ্ট রামপ্রসাদ কেবল কতিপয় পদাবলী রচনাদ্বারাই সাধারণ সমীপে পরিচিত রহিয়াছেন। তিনি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারিতেন এবং তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অগ্রজ, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। বিদ্যাসুন্দর কোন বঙ্গীয় কবির স্বকপোল কল্পিত কাব্য নহে। শুনা যায়, বররুচি-প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থই ইহার মূল। সেই গ্রন্থের আভাস গ্রহণ

করিয়া প্রথমে প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী, তৎপরে রামপ্রসাদ এবং সর্ব্বশেষে ভারতচন্দ্র স্ব স্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে প্রাণরামের সে গ্রন্থ আর বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় না। কবিরঞ্জন, বিদ্যাসুন্দর ভিন্ন কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে আর দুই খানি গ্রন্থের রচনা করেন। তিনি সকল রস বর্ণনাতেই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ইহাঁর রচনা ওজস্বী, প্রগাঢ় এবং অনুপ্রাস বহুল। যেখানে রামপ্রসাদ পরমার্থ প্রসঙ্গ ও কালীনামের গন্ধ পাইয়াছেন সেই স্থানেই রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাঁর রচনা সরল নহে, এক বিদ্যাসুন্দরেই কোমল ও সরল, কুটিল ও কর্কশ রচনা প্রায় সম পরিমাণে মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদ অনেকগুলি পদাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন; অদ্যাপি ভিক্ষুকেরা সেই সকল রামপ্রসাদী পদ গান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কবিবর এই রূপ গীত রচনায় বঙ্গদেশে অদ্যাবধি অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার গানগুলি অতি সরলভাষায় বিরচিত।

যেখানে যে প্রকার বর্ণনা করা উচিত, কবিরঞ্জন সে বিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিয়াছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে ছন্দোদোষে লিপ্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। স্থানে স্থানে অপ্রসিদ্ধ মিলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল দোষসত্ত্বেও তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি তৎপ্রতি কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের প্রতি।

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি,) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায় মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে ;—
" ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই! যারে ফিরে ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।—চ-ক।

শ্রীবন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বদক্ষিণ এক ক্রোশ অন্তর অঞ্জনা নদীতীরে, এক সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করেন, এবং তাহার নাম শ্রীবন রাখেন। ঐ স্থান অতি রমণীয়। অঞ্জনা, যদিও ইদানীং স্থির সলিলা হইয়া পতিবিহীনা হইয়াছে, তথাপি তদীয় পূর্ব্বকালীন মনোহারিণী শোভা একবারে তিরোহিত হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত উহার উভয়কূলে গ্রাম্য বৃক্ষসমূহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে,

এরূপ অপরূপ শোভা হইয়া রহিয়াছে, যেন, কোন প্রকৃতি-প্রিয় মহাপুরুষ, স্বভাবের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায়, নিবিড় কানন মধ্যে এই জলাশয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাহ্নে, অপরাহ্নে অথবা রজনীকালে, এই নদীতে নৌকারোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নয়ন সঞ্চরণ করিবামাত্র অসুস্থ হৃদয়ের সুস্থতা লাভ হয়। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে আমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুসূদন এই নদীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে কহিয়াছিলেন, "হে অঞ্জনে, তোমাকে দর্শন করিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, তোমাকে কখনই ভুলিব না এবং তোমার বর্ণনা করিতেও ত্রুটি করিব না।" এই রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা, এই নদীতটস্থ প্রাসাদের দক্ষিণদিকে যে কানন আছে তাহাতে বিবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার নাম মধুপোল, এবং ঐ কাননের পূর্ব্বাংশে যে উপবন আছে, তাহার নাম আনন্দকানন রাখেন। মধুপোল অশোক, চম্পক, বক, কাঞ্চন, নাগকেশর, মুচকুন্দ, কিংশুক, শাল্মলী ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ শ্রেণীতে শোভিত ছিল; এক্ষণে কেবল কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষ মাত্র আছে; তথাপি বসন্তকালে, এই তরুরাজি বিকসিত রক্তবর্ণ কুসুমাবলিতে অলঙ্কৃত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল একদা আমাদিগের সুবিখ্যাত কবি মদনমোহন বাক্যরত্নাকর (তর্কালঙ্কার), এই শোভা সন্দর্শনে লিখিয়াছিলেন, "জগদীশ্বর সর্ব্বভূতকে অদ্ভুত প্রদর্শনার্থ যেন রাশীভূত সিন্দূর রক্ষা করিয়াছেন।"—ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত।

সদাগরের কমলেকামিনী দর্শন ।

অপরূপ হের আর, দেখ ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার,
ধরি রামা বাম করে, উগরিয়ে করিবরে,
পুনর্ব্বপি করয়ে সংহার ।
কমল কনক রুচি, স্বাহা, সুধা কিবা শচী
মদন সুন্দরী কলাবতী,
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী ।
রাজহংস রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি,
দশনখে দশচন্দ্র ভাসে,
কোকনদ দর্প হরি, বেষ্টিত যার কবরী,
অঙ্গুলে চম্পক পরকাশে ।
অধর বিম্বক বিন্দু, বদন শরদ ইন্দু,
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন,
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর ফোটা,
তনুরুচি ভুবনমোহন ।
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারের করে সাক্ষী,
কর্ণধার করে নিবেদন,
করি পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।—চণ্ডী ।

কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন ।

দিবারাত্রি জাগরণে এবং একপ্রকার ক্লেশে বালিকার [illegible]

করিতেছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী অনাবৃত হস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশ-মণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়ন স্নিগ্ধকর; কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে চন্দ্র নাই। তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডল-মধ্য-বর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দৈবী মূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সনাথ চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। প্রথমে সেই চন্দ্রমণ্ডল সহস্র শীতল রশ্মিস্ফুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডল-মধ্য-শোভিনী, আলোকময় কিরীট কুণ্ডলাদি ভূষণালঙ্কৃতা মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের আকৃতি। রমণীয় কারুণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে, স্নেহ পরিপূর্ণ হাস্যে অধর স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সভয়ে, সানন্দে চিনিল, যে সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে "মা" কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে, জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থা কুন্দের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইতেছিস্। আমি জানিতেছি

যে বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়ঃ, এই কুসুম-কোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।” কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল যে, “কোথায় যাইব?” তখন কুন্দর জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্বলিত নক্ষত্রলোক দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, যে “ঐ দেশে।” কুন্দ তখন যেন বহু দূরবর্ত্তী, বেলাবিহীন অনন্তসাগর পারস্থবৎ অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, “আমি অতদূর যাইতে পারিব না; আমার বল নাই।” তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদ জনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল, এবং তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, “বাছা! যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে, ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোক প্রতি চাহিয়া তথায় যাইবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া, আমাকে মনে করিয়া আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার আসিয়া দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে আকাশ প্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে সে পথে যাইও না।”

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী, অঙ্গুলিসঙ্কেতের দ্বারা গগনোপান্তে দেখাইলেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল, সকরুণ কটাক্ষ; তাহার মরালবৎ দীর্ঘ, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা, এবং অন্যান্য মহাপুরুষ-লক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহাঁ হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার দেবকান্তরূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধর বোধে ইহাঁকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগন-প্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী, পদ্মপলাশনয়নী যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী বলিলেন; "ঐ শ্যামাঙ্গিনী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতে বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল এবং তৎসহিত তন্মধ্যবর্ত্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।—বিষবৃক্ষ।

বনদর্শনে সাবিত্রীর মনের ভাব।

আহা! কি সুন্দর সই এ বিজন স্থান,
বিধাতা করেছে কত সুখের নিধান।

নাহি পৌর-কোলাহল শ্রবণ বিরস,
সতত সঞ্চরে হেথা শান্তি সুধা-রস।
না বহে অনিল মন্দ পূতিগন্ধ ভার—
বিষম অনিষ্টকারী গরল আকার।
অধর্ম্মের স্রোত হেথা নহে প্রবাহিত,
মর্ম্মত্যাগী দ্বেষানল না হয় জ্বলিত।
নাহিক শোণিত-স্রাবী তুমুল সংগ্রাম,
নাহি জয়, পরাজয়, সকলি বিরাম।
বাহিরে শোভন, তীব্র গরল অন্তর,
আর নাহি সাধ মোর যাইতে নগর।
অভিলাষী—এ বিজনে থাকি একাকিনী,
বনের হরিণী মম হইবে সঙ্গিনী।
নাহি চাই অট্টালিকা সুধা ধবলিত,
সে কি পারে মোর মন করিতে মোহিত।
সুশীতল তরুতল, আর কুঞ্জবন,
বিধাতা-নির্ম্মিত মম সুখের সদন।
চাহি না কনক-রত্ন গঠিত ভূষণে,
নাহি সাধ নীলোজ্জ্বল মহার্হ বসনে।
বনজ মুকুল, ফুল করিব চয়ন,
সুকরে গাঁথিব মালা, হবে আভরণ।
আহরি বল্কল বনে পিধানের তরে,
নিরমিব চীর-বাস, পরিব সাদরে।
নাহি চাই উপাদেয় সরস ভোজন,
বন্য ফলমূল মম সুখদ অশন।
চিত্র রাজ ছত্র মণি-কাঞ্চন খচিত,

বৈতালিক, বন্দিগণ নেপথ্যে স্তুবিত,
রতন-মণ্ডিত স্বর্ণ রাজ সিংহাসন,
এসব লোভনে মোর নাহি যায় মন।
কুসুম শোভিত লতা, তরু ঘন পত্র
দিবে স্নিগ্ধ ছায়া মোরে, হবে আতপত্র।
কলকণ্ঠ পাখিকুল হবে বৈতালিক,
নিত্য জাগাইবে মোরে গায়ি প্রভাতিক।
তৃণাবৃত তরুমূল, কুঞ্জ-আয়তন
হইবে অপূর্ব্ব মম নৃপতি-আসন।
এ বিজনে হেন ভাবে হয়ে এক মন,
দেব আরাধিয়া সুখে কাটাব জীবন।
হেন নিরমল সুখ ভুঞ্জিবার তরে,
কে না সই রাজ্যসুখ ছাড়ে অকাতরে!
সত্য সই! শুন মোর আন্তরিক কথা—
যাইতে আমার মন নাহি চায় তথা।
এ কান্তারে প্রকৃতির শোভা দরশনে,
যাপিব জীবত কাল, আনন্দিত মনে।—সা গ্রী-চ কৃত।

ভরত-বিলাপ।

ভরতের ক্রন্দন শব্দ শ্রবণ করিয়া, বশিষ্ঠদেব ত্বরায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিমান জ্ঞানরাশির ন্যায়, গম্ভীরস্বরে কহিলেন, রাজকুমার! রোদন সংবরণ কর। তরল-প্রকৃতি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় কাতর হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

দেখ, প্রাণী মাত্রেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অধীন। জন্মিলেই মৃত্যু হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কেহ চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে না। আজি হউক বা দুইদিন পরে হউক, সকলকেই কালধর্ম্মের অনুগত হইতে হইবে। তখন আর পার্থিব বিষয়ের সহিত কোন সম্পর্কই থাকিবে না; পুত্র কলত্রাদির সহিত সম্বন্ধ একবারে তিরোহিত হইবে। যে দেহের নিমিত্ত কত যত্ন, কত আয়াস স্বীকার করিতে হয়, সেই দেহই পরিশেষে ধূলায় বিলুণ্ঠিত ও ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যখন প্রাণিমাত্রই ধ্বংসশীল, তখন আর তাহার নিমিত্ত শোক করায় ফল কি? আবও যদি জানিতাম যে, শোক করিলে বিনষ্ট প্রিয়পদার্থের সহিত পুনর্ম্মিলনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে অনুশোচনা করায় ক্ষতি নাই। কিন্তু যখন দেখিতেছি, একবার জীবন গত হইলে আর কিছুতেই তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তিত কবিতে পারা যায় না, তখন আর বৃথা শোক মোহে অভিভূত হইবার প্রয়োজন কি? বৎস! এই যে সংসার দেখিতেছ, ইহা অতি বিচিত্র। সংসারের কোন বিষয়েরই স্থিরতা নাই। প্রাতঃকালে জগতে যে ভাব দর্শন করা যায়, মধ্যাহ্নকালে সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভাবান্তর লক্ষিত হইতে থাকে। আবার সায়ংকালে অন্যবিধ ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। ইষ্ট-বিয়োগ নিবন্ধন অন্তঃকরণে শোকের উদয় হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যের হৃদয়ে উহা অধিকক্ষণ স্থান প্রাপ্ত হয় না। তুমি জ্ঞানবান ও পণ্ডিত, তোমার বিশিষ্ট রূপ কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান

জন্মিয়াছে। অতএব বৎস! তুমি সংসারের অসারতা ও বস্তুমাত্রেরই অনিত্যতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, চিত্ত স্থির কর; এবং মনোমন্দির হইতে শোক, দুঃখ একবারে দূরীভূত করিয়া দাও।

বৎস! যৎকালে মহারাজ পরলোক গমন করেন, তখন রামচন্দ্র বনে গমন করিয়াছিলেন, এবং তোমরাও কেহ এখানে উপস্থিত ছিলে না; সেই কারণে আমি মহারাজের মৃতদেহ তৈলপূর্ণ পাত্রে সংস্থাপিত করাইয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে, সর্ব্বশোক বিস্মরণ পূর্ব্বক, তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া পুত্রের কার্য্য কর; এবং রাম যেমন পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনে গমন করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও পিতৃ-আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক প্রজাপালন কার্য্যে দীক্ষিত হও।

ভরত, বশিষ্ঠদেবের উপদেশ বাক্য আকর্ণন করিয়া ক্ষণকাল অধোমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর অতিবৃহৎ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, চক্ষের জল মার্জ্জন করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন, ভগবন্, পিতার মৃত্যু ও অগ্রজের নির্ব্বাসন, উভয়েই আমার চিত্তকে একবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি সকল, যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যের পদে পদে বিপদ ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় এরূপ বিপদের উপর বিপৎপাত কখন কাহার কাছে ঘটে নাই। এই কারণে আমি কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না। শোকমোহে অভিভূত হওয়া উচিত নহে, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; কিন্তু কি করি

কিছুতেই আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না। এই বলিয়া অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বশিষ্ঠদেব পিতৃপ্রেতক্রিয়া করণার্থে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, ভরত কথঞ্চিৎ শোকাবেগসম্বরণ করিয়া, যে স্থানে পিতার মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, তথায় তাঁহার সহিত গমন করিয়া, পরিশেষে সরযূনদীতীরে পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিলেন।—রামের রাজ্যাভিষেক।

গঙ্গাবন্দনা।

পবিত্র বাহিনী গঙ্গে. তরল রজত অঙ্গে,
আবির্ভূতা বিষ্ণু পদতলে.
তারিবারে বসুন্ধরা, পুণ্যতোয়া সরিদ্বরা.
অবতীর্ণা অবনীমণ্ডলে,
নমোনমঃ ভাগীরথি তুমি মা পরমগতি,
সর্ব্বতীর্থময়ী সুরেশ্বরী.
সংসার সংসর্গ ব্যথা, অনন্ত দুরন্ত ব্যথা,
ত্রাহি মে ত্বরায় কৃপা করি।
জীবনের পরিণাম, তব পদে সঁপিলাম
জননি গো করো না বঞ্চনা,
জন্মশোধ কুতূহলে, জুড়াব তোমার জলে,
এ জন্মের জ্বলন্ত যন্ত্রণা।
সুখসাধ পরিহরি, আত্মবিসর্জ্জন করি,
চরমে চরণে দিও স্থান,
তনয়ে তারিতে ভার, জননি না দিলে, আর,
কার কাছে কাঁদিবে সন্তান?—উদাসিনী।

সৎবৃত্তির প্রাধান্য।

পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বৃত্তির এক এক প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, উপার্জ্জন করা অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রয়োজন, পরোপকার করা উপচিকীর্ষা বৃত্তির প্রয়োজন, ইত্যাদি। জগদীশ্বর যে কার্য্য সাধনার্থ যে বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক স্থলে এক বৃত্তির সহিত অন্য বৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়। এক বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, অন্য বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতে থাকে। অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তি থাকাতে উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে উপার্জ্জন করাও বিহিত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরের অর্থাপহরণ করা ন্যায়পরতা বৃত্তির অভিমত নহে। অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তি পরধনহরণে প্রবৃত্তি দিতে পারে, কিন্তু ন্যায়পরতাবৃত্তি তাহা নিষেধ করিয়া থাকে; সুতরাং এক বৃত্তির উপদেশ স্বীকার করিতে গেলে, অন্যবৃত্তির উপদেশ অস্বীকার করা হয়। অতএব এরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানবৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তিকে তাহাদের বশবর্ত্তী করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবতঃ হৃদয়ঙ্গম আছে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত

হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রধান প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। অতএব, এমন স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।—ধর্ম্মনীতি

সীতারাম সংবাদ।

মৃগরাজ বিরাজিত বিজন কানন,
হইল বিশাল রাজ্য আমার এখন,
গিরিগুহা লতাকুঞ্জ, পত্রের কুটীরপুঞ্জ
হবে প্রিয়ে রাজ-নিকেতন!
বনচর, নিশাচর বিষধরগণ,
অনুচর, সহচর, আমার এখন।
তরুলতা বনস্পতি— প্রজাবর্গ স্থানে তথি,
ফলপুষ্প কর আহরণ।
পবন—চামরধারী, মেঘ—ছত্রধর,
তদুপরি চন্দ্রাতপ—বিচিত্র অম্বর।
কুঞ্জে কুঞ্জে শিলাতল, তরুমূলে বেদিস্থল
সিংহাসন হইবে সুন্দর!
মধুর গায়ক ভৃঙ্গ, বিহঙ্গমগণ,
নর্ত্তক হইবে প্রিয়ে ময়ূর খঞ্জন।
শাখামৃগগণ সবে, রাজবিদূষক হবে,
প্রতিধ্বনি—অনুগত জন।
তটিনী নির্ঝরে পাব নির্ম্মল জীবন,
পানপাত্র—তরুপত্র, অঞ্জলি-বন্ধন।

পদ্মপত্র সুবিমল, শৈবাল পল্লব দল,
কুশতৃণ শয্যায় শয়ন!
কণ্ঠভূষা হবে, প্রিয়ে, বনপুষ্পহার,
লতাপাশে জটাবদ্ধ—মুকুট মাথার!
মৃগচর্ম্ম বৃক্ষছাল, চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল,
ক্ষৌমবাস হইবে আমার!
মৃগয়া ব্যসন, বৃত্তি; ধনুমাত্র ধন;
কীর্ত্তি মধ্যে নদ নদী পর্ব্বত লঙ্ঘন।
সখা- ষড়্‌ঋতু কাল, দশদিক্ দ্বারপাল,
সভাসদ—স্বভাব সুজন!
বিবেক হইবে মন্ত্রী, অতি বিচক্ষণ—
সুবুদ্ধি সুশীল শান্ত প্রভুপরায়ণ।
ধৈর্য্যনামে মহাবীর— বিগ্রহ বিপদে স্থির—
সেনাপতি আমার এখন!
তথাপি সন্দেহ প্রিয়ে! নহে নিবারণ—
পারে কি না করিতে সে বিপক্ষ দলন?
জানকী-বিরহ-অরি, তার হাতে শঙ্কা করি,
বাঁচে কি না আমার জীবন!—রা, না।

ভারতচন্দ্র রায়।

বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার মধ্যে পেঁড়ো গ্রামে সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাস করিতেন। তিনি মুখটী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রচুর পরিমাণে বিভব বিষয়শালী হইয়া তিনি ক্রমে

ক্রমে রায ও রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বাটীর চতুর্দ্দিক্ গড়বন্দী ছিল, অদ্যাপি সে স্থানকে "পেঁড়োর গড়" বলিয়া থাকে।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, প্রথম চতুর্ভুজ, দ্বিতীয় অর্জ্জুন, তৃতীয় দয়ারাম এবং চতুর্থ ভারতচন্দ্র। ১৬৩৪ শকে ভারতের জন্ম হয়। ভূম্যধিকার সংক্রান্ত কোন বিবাদসূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের জননীকে কটূক্তি করেন, তন্নিমিত্ত তিনি উক্ত রাজসংসারের কোপনয়নে পতিত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হন। এই সময়ে ভারতচন্দ্র, পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তঃপাতী নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিয়া তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে এই দুই গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়া ঐ তাজপুরের সন্নিহিত শারদাগ্রামের কেশরকুনি ভট্টাচার্য্যদিগের একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে তাঁহার বাটীর সকলেই বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করায় ভারতচন্দ্র অভিমান পরবশ হইয়া পুনর্ব্বার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং হুগলী প্রদেশের অন্তঃপাতী বাঁশবেড়ের পশ্চিম দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সি নামা জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-ভবনে বাস করিয়া পারসী ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়েই তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে অধিক সময়ক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বদাই প্রায় পারস্য ভাষা অভ্যাসে নিযুক্ত

থাকিতেন। তিনি যে অনতি-সাধারণ পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দিবসে একবার রন্ধন করিয়া তাহাই দুই বেলা আহার করিতেন, কখন কখন ব্যঞ্জনের মধ্যে বার্ত্তাকু দগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু ঘটিয়া উঠিত না।

এই সময়ে তিনি ক্রমান্বয়ে দুইখানি সত্য নারায়ণের পুঁথি রচনা করেন। এক দিবস মুন্সিদিগের বাটীতে সত্য-নারায়ণের পুঁথি পাঠ করিতে আদিষ্ট হইয়া তখনি এক-খানির রচনা করিয়াছিলেন। আর একখানিও কোন এক ব্যক্তির অনুমত্যনুসারে রচিত হয়। একখানি চৌপদী, অপরখানি ত্রিপদীছন্দে গ্রথিত। তখন আমাদের কবির বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করে নাই। এই নবীন বয়সে এতাদৃশ রচনা সাধারণ ক্ষমতার বিষয় নহে। ইহাই তাঁহার প্রকাশ্য রচনার সূত্রপাত।

পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রায় বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে এতাদৃশ কৃতবিদ্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি ভ্রাতৃবর্গের আদেশানুসারে তাঁহাদিগের মোক্তার হইয়া বর্দ্ধমানে যাত্রা করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পিতৃকৃত ইজারা ভূমি সম্বন্ধে অতি সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃগণ নিয়মিত সময়ে রাজস্ব প্রেরণে অসমর্থ হওয়ায় বর্দ্ধমানাধীশ্বর সেই ইজারাটী খাস করিয়া লইলেন। তাহাতে ভারতচন্দ্র আপত্তি উত্থাপন করায় রাজ-কর্ম্মচারিবর্গের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন।

অনন্তর কারারক্ষকের অনুগ্রহে গোপনে নিষ্কৃতি পাইয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজধানী কটকে গমন পূর্ব্বক শিবভট্ট নামা তত্রত্য দয়াবান সুবেদারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরে ৺পুরুষোত্তম ধামে কিছুদিন বাস করিবার প্রার্থনা করিলে সুবেদার পাণ্ডাদিগকে আদেশ করিলেন যে, ভারতচন্দ্র বিনা শুল্কে যদৃচ্ছা বাস করিতে পারিবেন এবং প্রতিদিন এক একটী বলরামী আটিকে পাইবেন। ভারতচন্দ্র শিবভট্টের এতাদৃশ অনুগ্রহে কৃতার্থ হইয়া তথায় ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মঠে অবস্থিতি করত শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করেন। যতদিন তথায় বাস করিয়াছিলেন, সশিষ্য গেরুয়াবসন পরিধান পূর্ব্বক সন্ন্যাসিবেশে কাল ক্ষেপ করিতেন, এবং সর্ব্বদা বৈষ্ণবদিগের সহিত পরমার্থ পর্য্যালোচনা ও শাস্ত্রালাপে আমোদিত থাকিতেন।

কিয়দ্দিনান্তে শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ৺ গোপীনাথজী দর্শনকরত কীর্ত্তনামোদে মত্ত হইলেন। সেই গ্রামে তাঁহার ভায়রাভাই বাস করিতেন। তিনি ভারতের আগমন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে সংসারাশ্রমে বিরাগসম্পন্ন দেখিয়া ক্রমে ক্রমে বিবিধ অনুরোধ ও প্রবোধ দ্বারা সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করাইলেন ও অনেক চেষ্টাদ্বারা তাঁহার বিবেকোন্মুখ চিত্তকে সংসারধর্ম্মে পুনরাকৃষ্ট করিলেন। কিন্তু ভারত কোন মতেই পিতা ও ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিলেন না। কহিলেন, যত দিন অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম না হই, তত দিন গৃহে গমন করিব না। কিছুদিন পরে ভারত-

চন্দ্র তাঁহার ভায়রা ভাই ভট্টাচার্য্যের সহিত শারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুরালয়ে গমনপূর্ব্বক মহাহর্ষে কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যাগমনকালে শ্বশুরকে অনুরোধ করিয়া আসিলেন "আমার পিতা কিম্বা ভ্রাতারা লইতে আসিলে আপনি আপনার কন্যাকে কদাচ পাঠাইবেন না।"

অনন্তর তিনি ফরাশী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান পালধী-বংশীয় ইন্দ্রনারয়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বিদ্যাবত্তার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সমুচিত সমাদর করিলেন। এই সময়ে ভারতচন্দ্র ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়া নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে থাকিয়া সর্ব্বদা চৌধুরী মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মধ্যে মধ্যে বিষয়কর্ম্মানুরোধে ফরাশডাঙ্গায় যাইতেন। একদা মহারাজের শুভাগমন হইলে চৌধুরী মহাশয় ভারতচন্দ্রের জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ সম্মত হইয়া ভারতকে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। কিছুদিন পরে ভারত কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে বহু সমাদর করিয়া মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বাসস্থান প্রদান করিলেন। ভারতচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে স্বরচিত দুই একটী কবিতা শুনাইতেন। প্রকৃত কবিত্বের কোন কালেই অগৌরব নাই। গুণগ্রাহী রাজা শীঘ্রই ভারতের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গুণাকর উপাধি প্রদান করিলেন এবং কবিকঙ্কণের প্রণীত চণ্ডীকাব্যের

প্রণালী অবলম্বন করিয়া অন্নদামঙ্গল নামক কাব্য রচনা করিতে আদেশ করিলেন। ভারত রাজাজ্ঞায় রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং একজন ব্রাহ্মণ সেই সকল রচনা লিখিতে লাগিলেন। নীলমণি সমাদ্দার নামক একজন গায়ক সেই সকল পালা-বদ্ধ গীতের রাগরাগিণী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন রাজসভায় গান করিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদ সেনের জীবনচরিত মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে দেখাইয়াছিলেন। রাজা ঐ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান অন্নদামঙ্গল মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে ভারতচন্দ্রকে আদেশ করিলেন। ভারতচন্দ্র উৎসাহ সহকারে ঐ উপাখ্যান রচনা করিয়া কৌশলে অন্নদামঙ্গল মধ্যে বিন্যস্ত করিলেন। এইরূপে ভারতচন্দ্রের অনন্য-সুলভ কীর্ত্তি-হেতুভূত অন্নদামঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি হইল। ১৬৭৪ শকে অন্নদামঙ্গলের রচনা শেষ হয়। অনন্তর ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী গ্রন্থের রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র অত্যন্ত সুরসিক অথচ বিশুদ্ধচরিত ছিলেন। প্রত্যহ যথানিয়মে জপ তপঃ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন, কোন ক্রমেই নিয়মভঙ্গ হইত না। মহারাজ, রসভাবচতুর গুণাকরের চরিত্র-পরীক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ কৌশল করিয়াও শুদ্ধাচারিতার বিরুদ্ধ কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হন নাই।

এইরূপে ভারতচন্দ্র অসামান্য কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যপ্রভাবে নরপতির প্রিয়সভাসদ হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রাজা তাঁহার সাংসারিক সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ৬০০৲ ছয়শত টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্ধারণ

পূর্ব্বক মূলাযোড়গ্রাম তাহাকে ইজারা দিলেন ও তথায় বাটী নির্ম্মাণের জন্য ১০০ একশত টাকা অর্পণ করিলেন।

ভারতচন্দ্র রাজদত্ত অর্থ ও সনন্দ পাইয়া পিতৃগৃহ-বাসিনী স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে আনয়ন করিলেন এবং প্রথমতঃ মূলাযোড়ে ঘোষালদিগের একটী ঘর লইয়া কিছুকাল বাস করিলেন। অনতিবিলম্বে নূতন গৃহ প্রস্তুত হইলে শুভদিনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। ভারতের পিতা এই সংবাদ শ্রবণে অন্তিমকালে সুরতরঙ্গিণীতীরে বাস করা শ্রেয়ঃ বিবেচনায় পরমানন্দে মূলাযোড়ে আসিয়া বাস করিলেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে তিনি নরলোকলীলা সংবরণ করিলে ভারত যথাসাধ্য পিতৃকৃত্য সমাধা করিয়া কৃষ্ণনগর গমন করিলেন। তথায় তিনি নানা বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের রচনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় বিদ্রোহে উপদ্রুত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা তিলকচন্দ্র রায়ের জননী রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূলাযোড়ের দক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। মূলাযোড় গ্রামখানি স্বয়ং পত্তনী লইতে অভিলাষ করিয়া বর্দ্ধমান-রাজমহিষী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে পত্র লিখিলেন। রাজা সম্মত হইলে তিলকচন্দ্রের জননী স্বীয় কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় পত্তনী লইলেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া ভারতচন্দ্র রাজসমীপে বিবিধ আপত্তি করায়, রাজা কহিলেন "তবে আনরপুরের অন্তঃপাতী গুস্তেগ্রামে গিয়া বাস কর।" এই বলিয়া তথায় ১৫০ বিঘা ও মূলাযোড়ে ১৬ বিঘা ভূমিতে আপন স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ব্রহ্মোত্তররূপে ভারতকে দান করিলেন। কিন্তু মূলাযোড়-নিবাসী ভদ্রলোকেরা ভারতকে কোনমতেই গুস্তেগ্রামে যাইতে দিলেন না। এদিকে নাগ ঐ স্থান পত্তনী লইয়া তত্রত্য লোকের উপর নানাবিধ অত্যাচার করায় ভারত-চন্দ্র ক্রোধপরবশ হইয়া সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বমণ্ডিত অষ্টশ্লোকাত্মক নাগাষ্টক প্রবন্ধের রচনা করিয়া পত্র সহকারে কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নাগাষ্টক পাঠে পরিতুষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বে নাগকে নতশির করিয়া দিলেন।

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে চণ্ডী-নাটকের রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে লোকান্তর গমন করেন।

ভারতের কবিত্ব-বিষয়িণী বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থ-বাহুল্য করিবার তাদৃশ প্রযোজন নাই; অপর সাধারণ সকলেই একবাক্যে তাঁহার কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইনি বঙ্গদেশীয় কবিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার লেখনীবিনির্গত সুললিত ও মধুর কবিতা শ্রবণমাত্র অন্তঃকরণ আনন্দভরে নৃত্য করিতে থাকে। এমন লালিত্যগুণ বঙ্গসাহিত্য সমাজে আর দ্বিতীয় নাই; তাঁহার রচনা মধ্যে কোনস্থানে একটী মাত্রও কর্কশ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্রের রচনাপাঠ, বিকসিত পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণের ন্যায় মনোহর, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তাঁহার কবিতা যখন পাঠ করা যায়, তখনই নূতন বোধ হয়, সেস্থান পাঠ করা যায়,

তাহাই পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে। বিরাম ও মিত্রাক্ষর সম্বন্ধে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি কবিকঙ্কণ সদৃশ কল্পনা শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু রচনা, কবিত্ব, ছন্দোবন্ধ, মিত্রাক্ষর ও প্রসাদগুণের একত্র-সমাবেশদ্বারা তাঁহার অন্নদামঙ্গল বাঙ্গলা সাহিত্য সমাজে প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ বাঙ্গলা ভাষায় কতদূর মনোহর কবিতা রচিত হইতে পারে দেখিতে চাহেন, তবে তিনি কবিকেশরী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবিতাবলী পাঠ করুন, তাঁহার কৌতূহল দীপ্ত হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

রাজপুত সাধুর বিবরণ।

যশল্মীর অন্তঃপাতী, দেশে ছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার;
পুগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধুনামা বিক্রম আধার।
মহা পরাক্রান্ত বীর, কভু নহে নতশির
প্রতাপেতে প্রখর তপন;
সঙ্গে সব সহচর, শূরবীর পরিকর,
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ।
হঠ ধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ্ হঠ্ সদাগতি,
সদাগতি পরাভূত তায়,
দড় বড় দড় বড়, অশ্ব চালনায় দড়,
ছোট বড় জানা নাহি যায়।

হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয়,
ধনিক বণিকগণ, ভীতচিত অনুক্ষণ,
কখন্ আসিয়ে লুটে লয়।
বালবৃদ্ধ বনিতারে, সদা তোষে সদাচারে,
যথা সমাদরে রক্ষা করে;
কিন্তু মিলে সমযোগ্য, সমর রসের ভোগ্য,
একবারে ভীমবেশ ধরে!
বিশেষ যবন প্রতি, সরোষ আক্রোশ অতি,
জ্বলিতাঙ্গ হযে একবারে,
লাফ দিয়ে চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শত খণ্ড করে তরবারে।
পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুপদী, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী
সাধুব শূরত্ব-অধিকার,
বিনশন * মহাটবী, যথা খর রবিছবি,
মরীচিকা করে আবিষ্কার।
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারিবিন্দুলেশ,
নাহি ছায়া, নাহি তরুলতা,
দূরে থেকে দৃষ্টি হয, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা।
তট পুষ্পে উপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষবল্লী ছায়া করে দান,
শ্রান্ত পান্থ চিত্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে ভাস্কর এ ভাণ!

---

* কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমাঞ্চল।

সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ ;
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন।
পাঁচ হাতিয়ার ধরা আপাদ মস্তক পরা,
অয়স রচিত পরিচ্ছদ ;
সুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝন্ ঝন,
ঝক্ মক্ ঝলক বিষদ।
শীতল কঠোর ধর্ম্ম, অসিচর্ম্ম আর বর্ম্ম,
সাজ শয্যা তাহাই সকল,
ঢালেতে রাখিয়ে শির. নিদ্রা যেত যত বীর,
কিছু মাত্র না হয়ে বিকল।
সেই ঢালে পিত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢাল ভোজন ভাজন,
কটিতটে চন্দ্রহাস, * চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন।
দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
অস্ত্র শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে,
বীর-রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা অনল হাড়ে হাড়ে।
কার প্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে,
অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে।

* তরবারী বিশেষ।

হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম ;
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম ;
সব পুরুষার্থশূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদজ্ঞান হইয়াছে গত ;
বীরকার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত।
নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি,
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী।
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন ?
কবে পুনঃ বীর-রসে, জগত ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন ?—বর্ম্মাদেবী।

দেশাচার।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য-দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ

করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক-রক্ষা-গুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধুপুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক-রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্ব দোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে। — বিধবা-বিবাহ-বিচার।

মোগল রাজলক্ষ্মী।

চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এক সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে,
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী কূলে;
'আভাহীনা, আভাময়ী, তবু জানা যায়,
চিক্কণ নীরদে ঢাকা যেন রবি-কায়,
আনিতম্ব বিলম্বিত ছিল একাবেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি-মুক্তা-শ্রেণী,
এবে বিষাদিনী, বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তা-পুঞ্জ পড়েছে মাণিক।
হীরক-নিন্দিয়ে জলে নয়ন উজ্জ্বল,
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জল,

পড়িতেছে গলে, তাহা অশ্রুবারি সনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভুষণে,"
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁদে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে ;
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ-যুগল,
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল ,
দুই হস্তস্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর ,
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক-বিপিনে যেন জনক-দুহিতা।
সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী-রতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে—
"কে বাছা সুন্দরী তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ কিসে বিষাদিনী ?
গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিল উত্তর—
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে—
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগরা ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভুপ দ্বীপান্তরে গিয়ে।
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময়-সাগরে জলবিম্ব অনুভব,
কোথা গেল আধিপত্য শাসনভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখি-সিংহাসন ?
আদিত্য-প্রতাপ ভরে কাঁপিত ভুবন,

যোড়করে দাঁড়াইত হিন্দুরাজগণ,
রাজ্যচ্যুত তারা সব শোকাতুর মন,
লুঠেছে ভাণ্ডার সহ সজীব রতন,
উঠে গেছে দেখ ক্ষণ-ভঙ্গুর প্রতাপ,
বৃথায় রোদন আর বৃথা পরিতাপ!
আমি মাতা কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণি-বিহীনা ফণিনী,
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
সিহরি লজ্জায়, শোক নবীভূত হয়—
মোগলের রাজলক্ষ্মী পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছ মুকুট আমার।”
বাণী শেষ করি বালা হ'ল অন্তর্দ্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।—সুরধুনী কাব্য।

রামবর্জ্জন শ্রবণে লক্ষ্মণের ক্রোধ।

লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। একবার রামেরে রাজা করিয়া কৌশল্যার শোকশল্য উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন; আর বার জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মোপদেশ স্মরণ করিয়া অগ্রজের অনুবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হন; একবার কৈকেয়ীর ব্যবহার মনে করিয়া ক্রোধে অধীর হন; আর বার পিতার কথার অন্যথাচরণ অধর্ম্ম ভাবিয়া স্থির হন। পুনর্ব্বার লক্ষ্মণ অধীর হইলে কৌশল্যার আর্ত্তস্বর তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সুতরাং লক্ষ্মণ একেবারে ক্রোধে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন কুপিত-কেশরীর ন্যায় ভীষণ ভ্রূভঙ্গী বিস্তার করিয়া আরক্ত-

নয়নে বলিলেন, "রাজা লোক বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছেন! ছলক্রমে জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বনবাস দিতেছেন! কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিয়া পাপাচরণ করিতেছেন! স্ত্রী-বশীভূত হইয়া গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন! এই কি রাজার রাজধর্ম্ম? জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বঞ্চনা করা কি পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? আর্য্য আপনি ক্ষমা করিবেন! এত অন্যায় আচরণ আমার সহ্য হইবে না, এখনই ইহার প্রতীকার করিব। বিবাহ করিলেই পিতা পুত্রের শত্রু হন; স্ত্রৈণ পিতা কখনই পুত্রের মিত্র নয়; তাদৃশ পিতার কথা কি শ্রবণযোগ্য! আপনি কার্য্যদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন? কি অসম্ভব। কখনই পারিবেন না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করিবেন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। বঞ্চকদিগের উৎপন্নমতি, বঞ্চনাই তাহাদিগের অভ্যসনীয় বিদ্যা; আত্মকার্য্য সিদ্ধিই তাহাদিগের উদ্দেশ্য, পরের শুভ উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের মন সমৎসর হয়; যতক্ষণ পরের শুভের ব্যাঘাত না জন্মাইতে পারে, ততক্ষণ তাহাদের বিশুদ্ধ নিদ্রা হয় না। যাহারা উপস্থিত রাজ্যাভিষেকে এত বিঘ্ন ঘটাইল, তাহারা যে পরে ভদ্রতাচরণ করিবে ইহা মনেও ভাবিবেন না। যাহারা প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা সহসা স্বকার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে, তাহারা কাল পাইলে যে কত অন্যাচরণ করিয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। আর দৈব অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। দুর্ব্বল কাপুরুষেরা দৈব অবলম্বন করিয়া থাকে, বীর পুরুষেরা বাহুবলে সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন, আপনি স্থির হইয়া থাকুন, আমি

একাকী সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। আজ যদি কোন দিক্‌পাল আসিয়া অভিষেকের অন্তরায় হয়, তাহাকেও বিনষ্ট করিব। যে আপনারে বনে যাইতে বলিবে, তাহারে জন্মের মত বনবাস দিব. কৈকেয়ী যে দুরাশা করিয়াছে, তাহার সমূল নির্ম্মূল করিব। লক্ষ্মণের এই বাহু, শোভার জন্য নহে; লক্ষ্মণ এই ধনুঃ ভূষণের জন্য ধারণ করে নাই; কক্ষবন্ধনের জন্য অসিলতা রক্ষা করে নাই; ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া শাণিত শর সজ্জিত করে নাই। যে জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছি, তাহা এখনি সকলে প্রত্যক্ষ করিবে। নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিব। অধিক কি, এককালে খণ্ডপ্রলয় করিয়া তুলিব।”

রাম লক্ষ্মণেরে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, “বৎস! লোকে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য সন্তানের কামনা করে। যদি সন্তান দ্বারা পিতার ঐহিক ও পারত্রিক সুখ না হইল, তবে তাহার প্রার্থনা তিনি কেন করিবেন। পিতৃসত্য পালন না করিলে পিতা পতিত হইবেন? যে পুত্রের দোষে পিতাকে পতিত হইতে হয়, সে কুপুত্রের জন্ম না হওয়াই ভাল। পিতা সন্তানের গুরু ও উপাস্য দেবতা, তাঁহার আদেশ কোন ক্রমে অন্যথা করিতে পারিব না; পিতৃসত্য পালন করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারিব। ক্ষণিক সুখভোগের জন্য গুরুলোককে গুরুতর ক্লেশ দেওয়া অনুচিত। যদি তোমার আমাতে স্নেহ ও ভক্তি থাকে, তবে পাপমতি পরিত্যাগ কর। আমার প্রিয়কার্য্য করা যদি তোমার অভিলষিত হয়, তবে আমি বনে গমন করিলে দেবতার ন্যায় পরম আরাধ্য

পিতা মহাশয়কে সেবা করিবে, কেকয়নন্দিনী প্রভৃতি জননীদিগকে অভিন্নভাবে শুশ্রূষা করিবে; আর প্রাণাধিক ভরতেরে আমার ন্যায মান্য এবং যথোচিত স্নেহ করিবে।"

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের উপদেশ শুনিয়া রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করিলেন এবং অনুনয় করিয়া বলিলেন, "লোকনাথ! তোমার যে গতি, লক্ষ্মণেরও সেই গতি হইবে, আপনি বনে গমন করিলে আমি আপনার অনুগমন কবিব; আপনার পরিত্যক্ত-স্থান স্বর্গধাম হইলেও লক্ষ্মণের মনোনীত হইবে না। আপনার পরিত্যক্ত রাজধানী অপেক্ষা আর্য্য-সেবিত নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যও আমার রমণীয় বসতিস্থান। আমি বনে বনবিহারী আর্য্যের আহারার্থে ফলমূল আহরণ করিব, দুর্গম স্থানে আপনার সহায় হইব, এবং আজ্ঞাকর কিঙ্করের ন্যায়, সর্ব্বদা সতর্কতা পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। অতএব আর্য্য! আবশ্যক কর্ম্মের জন্য অনুগত অনুজের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অনুগমন অনুমতি করুন।"— রামবনবাস।

আশার ছলনা।

আশাব ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায,
তাই ভাবি মনে!
জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায—
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কতকাল রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলে ঝলে ?
কে না জানে অম্বুমুখে অম্বুবিম্ব সদ্যঃপাতি !
নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?—
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে,
এ তিনের ছল সম, ছল যে এ কুআশার
বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে—
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?
যশোলাভ লোভে আয়ুঃ, কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য বিষ-দশন, কামড়ায়ে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায় !

—মাইকেল মধুসূদন দ

দেবমন্দির।

৯৯৮ বাঙ্গাব্দের নিদাঘ-শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী-পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন-মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকালমধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য-পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্বরজ্জু শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছা গমন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঘোটক-চরণে কোন কঠিনদ্রব্য সংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময় একবার বিদ্যুৎ-প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লম্ফত্যাগে ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপা-

অবনির সংঘর্ষে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল, অতএব নিকটে আশ্রয়স্থান আছে জানিয়া অশ্বকে যথেচ্ছা স্থানে যাইতে দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপান-মার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতা লোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্রদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ, মস্তমার্জ্জন জানিলেন, দ্বার বহির্দিক্ হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তর-স্থিত মন্দিরে এমত সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন শিরোপরে প্রবলবেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়-মধ্যবাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন; কেহই দ্বার উন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক্ ততদূর করিলেন না; তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রয়োগ করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিবা যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি মন্দির মধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্তদ্বার-পথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা নির্ব্বাণ হইয়া গেল। মন্দির মধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার

অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবাপুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দির-মধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকার মধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দির মধ্যে কে আছ ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না ; কিন্তু অলঙ্কার-ঝঙ্কার-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকা-প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নির্ব্বিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর ; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে যদি পুরুষ হও তবে ফলভোগ করিবে। আর যদি স্ত্রীলোক হও তবে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।—দুর্গেশনন্দিনী।

রাম দর্শনে মিথিলাবাসিনীগণের উক্তি।

বয়সে অধিক যত মিথিলার নারী
আনন্দ অন্তরে কহে বাক্য মনোহারী।
কোন্ ভাগ্যবতী কত তপ করিয়াছে,
হেন পুত্র যে উদর মাঝে ধরিয়াছে।
আহা মরি নবনীত-জিনি মৃদু দেহ,
চলিতেছে রবি-তাপে কি করিয়ে এহ !
যদি আমাদের বশ হতো পুরন্দর,
মেঘে করি ঢাকিতাম তবে ত অম্বর !

হে বায়ু জগত-জীবন তব নাম,
মন্দ বহি উহার ঘুচাও তুমি ঘাম।
বুঝেছি ইহার মাতা নিরদয় হিয়া,
হেন পুত্রে বিদেশে পাঠায় কি করিয়া?
যদি মোর পুত্র হৈত রাম গুণমণি,
নেত্রপথে রাখিতাম দিবস রজনী।
মরি হেন পুত্রেরে বিদেশে পাঠাইয়া,
কেমন করিয়া আছে হৃদয় ধরিয়া?
আর জন কহে ওগো তো বড় কুমতি,
কভু নাহি নিন্দা কর তেন ভাগ্যবতী।
যদি সেই না পাঠাত সুতে এদেশেতে,
হেন রূপ তোমরা দেখিতে কি রূপেতে।
কৌশল্যা রাণীর ভাগ্য কে কহিতে পারে,
রামচন্দ্র চাঁদ মুখে মা বলয়ে যারে!
মা বলি যে কালে রাম কাছে যায় তার,
না জানি কি সুখে মগ্ন হয় মন তার!
জনকের রাণী দেখি শ্রীরঘুনন্দন,
চিন্তা করে মনে বিধি বড়ই কৃপণ।
যদি বিধি না করিত ক্রূর ধনু পণ,
তবে রামে করিতাম সীতা সমর্পণ।—রামরসায়ন।

বন্ধুশোকাতুর।

অনন্তর নিঃশব্দ-নিশীথপ্রভাবে দূর হইতেই "হা হতো-
হস্মি—হা দগ্ধোঽস্মি—হায় কি হইল—রে দুরাত্মন্ পাপ-

কারন্ পিশাচ মদন! কি কুকর্ম্ম করিলি—আঃ পাপীয়সি দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে! তিনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন—রে দুশ্চরিত্র চন্দ্রচণ্ডাল! এক্ষণে তুই কৃতকার্য্য হইলি—রে দক্ষিণানিল! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল—হা পুত্রবৎসল ভগবন্ শ্বেতকেতো! তোমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছ না? হে ধর্ম্ম! তোমাকে আর অতঃপর কে আশ্রয় করিবে? হে তপঃ! এত দিনের পর তুমি নিরাশ্রয় হইলে। সরস্বতি! তুমি বিধবা হইলে। সত্য! তুমি অনাথ হইলে। হায়! এত দিনের পর সুরলোক শূন্য হইল। সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি। চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন, বান্ধববিহীন হইয়া কিরূপে এই দেহভার বহন করি। কি আশ্চর্য্য! আজন্ম পরিচিত ব্যক্তিকেও অপরিচিতের ন্যায়, অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায়, পরিত্যাগ করিয়া গেলে? যাইবার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করিলে না? এরূপ কৌশল কোথায় শিখিলে? এরূপ নিষ্ঠুরতা কাহার নিকট অভ্যাস করিলে? হায়! এক্ষণে সুহৃৎ-শূন্য, সহোদর-শূন্য হইয়া কোথায় যাইব? কাহার শরণাপন্ন হইব? কাহার সহিত আলাপ করিব? এত দিনের পর অন্ধ হইলাম। দশদিক্ শূন্য দেখিতেছি। সকলই অন্ধকারময় বোধ হইতেছে! এই ভারভূত জীবনে আর প্রয়োজন কি? সখে! একবার আমার কথার উত্তর দেও। একবার নয়ন উন্মীলন কর। আমি তোমার প্রফুল্ল মুখকমল একবার অবলোকন করিয়া জন্মের মত বিদায় হই। আমার সহিত তোমার সেই অকৃত্রিম প্রণয়

ও অকপট সৌহার্দ্দ্য কোথায় গেল ? তোমার সেই অমৃতময় বাক্য ও স্নেহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে।” কাপিঞ্জল আর্ত্তস্বরে মুক্তকণ্ঠে এই রূপ ও অন্যরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন শুনিতে পাইলাম। —কাদম্বরী।

চাঁদ সদাগরের নৌকায় ঝড়বৃষ্টি।

দেবীর আজ্ঞায়, হনুমান ধায়, শীঘ্র লয়ে মেঘগণ,
পুষ্কর দুষ্কর, আইল সত্বর, করিতে ঝড় বর্ষণ।
আসি কালীদয়ে, করিল উদয়ে, ডুবাতে সাধুর তরি,
বীর হনুমান, অতি বেগবান, করিবারে ঝড় বারি,
অবনী আকাশে, প্রখর বাতাসে, হৈল মহা অন্ধকার,
গঠিয়া গাবর নায়েব-নফর নাহিক দেখে নিস্তার।
গজ শুণ্ডাকার পড়ে জলধার ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে,
মনে পেয়ে ডর বলে সদাগর যাইতে নারিনু রাজ্যে।
হুড় হুড় হুড় পড়িছে চিকুর বেগে যেন ধায় গুলি,
বলে কর্ণধার নাহিক নিস্তার ভাঙ্গিল মাথার খুলি।
দেখিতে অদ্ভুত হইছে বিদ্যুৎ ছায় গগনের ভানু,
বিপদ জানিয়া বলিছে বেণিয়া কেন বা বাণিজ্যে আইনু।
তরি সাত খান চাপি হনুমান চক্রবৎ দেয় পাক্,
ঘন ঘন ঝড়ে, যেই সব উড়ে, প্রলয় পবনের ডাক।
কুম্ভীর হাঙ্গর আইল বিস্তর তরির আশে পাশে ভাসে,
জলে ডিঙ্গা লয়ে, রাখে পাক দিয়ে, অহি ধায় গিলিবার আশে।
ডিঙ্গায় নফর গ্রাসিল হাঙ্গর কাছি গিলিল মাছে,

চারিখা তরণী হনুমান আপনি ফেলায়ে দোলায়ে নাচে।
ডুবাইয়া নার চান্দ জল খায় অগাধীর থলথল হাস.
জয় জয় মনসা, মা তুমি ভরসা, রচিল কেতকা দাস।—ম-ভা:

শিক্ষিতাশিক্ষিতের সুখের তারতম্য।

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বীর্য্যহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎ-কৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নির্ব্বত থাকিয়া নিকৃষ্ট সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবনের মধ্যে গণনীয় হয়. সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখসম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তার-তম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।—চারুপাঠ ৩য় ভাগ।

মেনকানিকটে পার্ব্বতীর বিদায় গ্রহণ।

ঘর যেতে হর চায়, গৌরী গিয়া কহে মায়,
শুনি রাণী শোকে অচেতন,

রাম-বনবাস জানি, যেমন কৌশল্যা রাণী,
কাকুস্বরে করেন রোদন।
সুখময়ী রাজকন্যা, ভিক্ষুগৃহে দুঃখ গন্যা,
কেমনে বঞ্চিবে তুমি তায় ?
এই দুঃখে আমি সারা, পরাণ-পুতলি তারা
কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায় ?
পাইনু পরম সুখ, পাসরেছি সব দুখ,
নিরখিয়া তুয়া মুখ চাঁদে,
তোমারে বিদায় দিয়া, কেমনে ধরিব হিয়া,
মনের সহিত প্রাণ কাঁদে।
বসাইয়া বরাসনে, পালিব পরাণ-পণে,
মোর ঘরে থাক চিরকাল,
আমি যত দিন জীব, আর না পাঠায়ে দিব,
ফলভরে ভাঙ্গে নাহি ডাল।
ননীর পুতলি ছিল, জ্বলন্ত অনলে দিল,
বাপ দিলে কি করিবে মায়,
আমি অভাগিনী নারী, সকল খণ্ডাতে পারি,
কপাল খণ্ডান নাহি যায়।
গৌরীর গলায় ধরে, বিস্তর বিলাপ করে,
জননী কাঁদিয়া মোহ যায়,
মুছিয়া বদন খানি, বলিয়া মধুর বাণী,
পার্ব্বতী প্রবোধ করে মায়।—শিবসংকীর্ত্তন।

সুখ।

সুখের কিরূপ প্রকৃতি বুঝা ভার। কেহ বর্ত্তমান দুঃখ

নিবৃত্তিই সুখ। যখন ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হয়, যখন বন্দী মুক্তি পায়, যখন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যলাভ করে, যখন নৈরাশ্য-মেঘ হৃদয়গগন হইতে দূরীকৃত হয়, তখনই লোকে সুখানুভব করে। মেঘ না হইলে যেমন বিদ্যুৎ হয় না, তেমনই দুঃখ না হইলে সুখ হয় না। ক্লেশই সুখের অব্যবহিত কারণ। আবার দেখা যাইতেছে, যখন কোন বাসনা চরিতার্থ হয়, মনে সুখ জন্মিয়া থাকে। বাসনার স্বভাব ভাবিয়া দেখ। অন্তঃকরণে অভাব বোধ হয়, মন অস্বচ্ছন্দ হয়; যে পদার্থে সে অভাব মোচন হয়, সে অস্বচ্ছতা নিবারণ করিতে পারে, তাহা প্রাপ্ত হইতে চিত্তে এক প্রকার বেগ জন্মে। অতএব বাসনা নিবৃত্তি হইলে যে সুখ হয়, তাহা দুঃখ নিবৃত্তি হেতুক বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটে যে অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন দুঃখ না হইয়া উত্তরোত্তর সুখ বৃদ্ধি হয়, এরূপ স্থলে সুখকে কিরূপে দুঃখ নিবৃত্তি মাত্র বলা যাইবে? যখন লোকে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, তখন নূতন রসিকতার কথায় আমোদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এখানে ত সুখের অগ্রে দুঃখ দেখা যাইতেছে না। যতটুকু সুখ বৃদ্ধি হইল, সুখের উপরই বাড়িল। দুঃখের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা আর থাকিল না। সুতরাং সুখ—ভাব, অভাব দুই প্রকার পদার্থেরই অন্তর্ভূত। সুখনামক এক প্রকার বিশেষ অনুভবও আছে। দুঃখানুভবের অভাবও সুখ।—রাজবালা।

পাতালে অশ্ব প্রাপ্তি ও সগরসন্তান বিনাশ।

দেখি সবে ঘোড়া বাঁধা মুনির নিকটে,
শিহরিয়া বলে ভাই চোর সাধু বটে।
চোরের চরিত্র চিন্তা বুঝিল সংশয়,
ঘোড়া চোর বেটাতো সামান্য লোক নয়?
বলে দেখ বসিয়া কি ভাব পরিপাটি,
চিনিব বলিয়া গায় মাখিয়াছে মাটি।
কেহ বলে চোরের সাহস দেখ ভাই,
এত ধুম ধামে কিছু ভুরুভঙ্গ নাই।
দেখ না রুদ্রাক্ষমালা এই এক ছলা,
নখে বুঝি সিঁদ কাটে সাক্ষী রাখে মালা।
চটাগুলা মোটা দেখ মরি কি নয়ন,
দৃষ্টি নাই মন্ত্র সিদ্ধি চোর যেন নন!
কেহ বলে ঘোড়া চোর ভাবনা ভাবক
পুরুষানুক্রমে মহাবিদ্যা উপাসক।
কিবা সে বিদ্যার মর্ম্ম বুঝ না হে ভাই,
কুঁয়েতে খেয়েছে অঙ্গ তবু উঠে নাই।
সাত পাঁচ ভাই মিলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
প্রকৃততো চোর নয় উত্তর দিবে কারে?
মহাবিদ্যা উপাসনা করে সে কপিল,
রাখি পাদপদ্মে মন আঁটিয়াছে খিল।
যোগে ভাবে থাকে কভু নাহি বাহ্যজ্ঞান,
অন্তরে করিছে পদাম্বুজ-মধুপান।
মায়ের চরণে তার যোগেতে বসিয়া,

লক্ষ লক্ষ যুগ গেল আনন্দে বসিয়া।
ভক্ষণ কেবল বায়ু পর্ব্বতে আছিল,
ভাবিতে ভাবিতে পদ সেহ না রহিল।
কাটে যে সংসার মায়া সকল জঞ্জাল,
কালীনাম অমৃতে তো কাটে মহাকাল।
সেই কালীনাম-বলে বল যে মুনির,
যম যারে পূজে কি করিবে শূরবীর।
রাজপুত্র সকলেতে ডাকে মুনিবরে,
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে পদাঘাত করে।
পদাঘাতে মর্ম্মপীড়া পায় মুনিবর,
চক্ষু মেলে কোপভরে কাঁপে কলেবর।
কপিলের ক্রোধভরে প্রাণ বাঁচা ভার,
দৃষ্টিমাত্র ভস্ম ষাটি হাজার কুমার।—গ, ভ, ৩,।

রাজা রামমোহন রায়।

১৬৯৬ শকে (১৭৭৪ খৃঃ অঃ) হুগলী জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর নামক গ্রামে ৺ রামকান্ত রায়ের ঔরসে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রামমোহন শৈশবকালে গ্রাম্য গুরু মহাশয়দিগের পাঠশালায় তৎকাল প্রচলিত রীতি অনুসারে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পাটনানগরীতে গমন পূর্ব্বক পারসী ও আরবী অধ্যয়ন করেন। এই ভিন্নদেশীয় ভাষার অনুশীলনকালেই হিন্দুদিগের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। তদ-

পরে তিনি বারাণসী গমনপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলন দ্বারা তাঁহার প্রথমোদ্বুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার প্রতি বিদ্বেষভাব বিচ্ছিন্ন না হইয়া বরং দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি পুরাণপ্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্ম যাহাতে সকলের মন হইতে অপনীত হয় এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং" বচনানুসারে অদ্বিতীয় পর ব্রহ্মের উপাসনা দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, তদর্থ যত্নবান হইলেন, এবং তদুপায় স্বরূপ ১৬বর্ষ বয়ঃক্রম সময়েই "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থ দর্শনে তাঁহার পিতা বড়ই বিরক্ত ও কুপিত হইলেন; তাহাতে রামমোহন দুঃখিত হইয়া পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের নানাস্থানের প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীর অবগতির জন্য অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার অভিলাষে তিব্বৎ দেশে গিয়া ৩ বৎসর কাল বাস করিলেন এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার বাটী আসিয়া শাস্ত্রানুশীলন ও "ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রচারের চেষ্টাতেই সতত উদ্যত রহিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি ইঙ্গরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত ৬।৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহাতেও বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন—এরূপ পারদর্শী যে, ইঙ্গরেজীভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করিয়া ক্রমে ক্রমে হিব্রু, লাটিন, গ্রীক্, ফরাসী প্রভৃতি সমুদয়ে ১০টী প্রধান প্রধান ভাষায়

লব্ধাধিকার হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি রঙ্গপুরের কালেক্টরের নিকট প্রথমে কেরানিগিরি ও পরে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনরব এই যে, ঐ স্থানে কর্ম্ম করিয়া তিনি বার্ষিক ১০,০০০ টাকা আয়ের এক জমীদারী ক্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। রঙ্গপুর ভিন্ন ভাগলপুর এবং রামগড়েও তিনি কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অনন্তর ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃঃ অঃ) কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর হইয়াছিল। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার দ্বারা কুসংস্কারাবিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদিগকে উৎকৃষ্ট পথে আনয়ন, এই দুই কার্য্যের চেষ্টাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিতের সহিত তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিচার করিতে হইত. সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত না—লিখিত হইত। এ জন্য তাঁহাকে ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষেরাও পাষণ্ডপীড়ন ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকরচনা করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল তাহা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এমন নহে—রামমোহন রায়কে ধর্ম্মনাশকারী বলিয়া পথিমধ্যে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ঐ প্রহারের ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষিবেষ্টিত হইয়া গমনাগমন করিতে হইত। কিন্তু

তিনি এ সমস্ত অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিয়া নিজ উদ্দেশ্য-সাধন বিষয়ে ক্ষণমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। যে সকল লোক তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তিনি "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয়" নামক একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে নিজ মতানুসারী গ্রন্থ এবং বিপক্ষদিগের প্রদত্ত দূষণার উত্তর সকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ তাঁহা কর্ত্তৃকই ১৮৫০ শকে (১৮২৮ খৃঃ অঃ) প্রথম সংস্থাপিত হয়। ১৭৫১ শকে (১৮২৯খৃঃ অঃ) রাজবিধি দ্বারা যে যে হিন্দু জাতীয় সতীদিগের মৃতপতির সহিত সহমরণপ্রথা নিবারিত হয়, রামমোহন রায় তদ্বিষয়েও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় রামমোহন রায়ের এই সকল কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে মহাদুঃখিত, ভীত ও কুপিত হইলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষার্থ 'ধর্ম্মসভা' নামে এক সভা সংস্থাপন করিলেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসভায় নানারূপ তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, এক্ষণে সে ধর্ম্মসভা আর জীবিত নাই।

রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত যাইবার জন্য বড়ই অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে দিল্লীর বাদসাহ তাঁহার নিজের কোন কার্য্যসাধনের উদ্দেশে তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান পূর্ব্বক বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন, তদনুসারে তিনি ১৮৩০ খৃঃ অব্দে ১৫ই নবেম্বরে অপর তিনজন

দেশীয় লোক সমভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় কোন হিন্দু বিলাত গমন করেন নাই। বিলাত যাইবার সময়ে জাহাজে তিনি কেবল শাস্ত্রানুশীলন, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়াই পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ ও বাক্‌পটুতা প্রভৃতির আধিক্য দেখিয়া তাঁহার পরম সমাদর ও মহাসম্ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াই ফ্রান্সে গমন করেন এবং তথা হইতেই রুগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যান এবং সেই স্থানেই ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭ এ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ব্রিষ্টল নগরের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হয়।

পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী, বেদান্তের অনুবাদ, কঠোপনিষদ্, বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, পথ্যপ্রদান প্রভৃতি রামমোহন রায়-রচিত যে কয়েকখানি বাঙ্গলা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ এবং পৌত্তলিক মতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্যদিগের সহিত বিচার। ঐ সকল বিচারে তিনি নিজে নানাশাস্ত্রবিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সে সকল অধ্যয়ন করিলে চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়। সে সকল ধর্ম্মসম্পৃক্ত বিষয় এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে প্রদর্শন করা আমাদিগের অভিমত

নহে, ইচ্ছা হইলে তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারিবেন। যাহা হউক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রামমোহন রায়ের সময়েই তাঁহার রচিত উল্লিখিতরূপ গ্রন্থ সকল এবং তদুত্তরে পৌত্তলিক মতাবলম্বী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের রচিত গ্রন্থ সকল ও পত্রিকা সকলের দ্বারাই বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গলা গদ্য রচনার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রামমোহন রায়-রচিত ধর্ম্ম-সম্পর্ক-শূন্য অপর কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবল গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ নামে একখানি ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা তিনি মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত বিলাত গমনের পূর্ব্বে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীকে প্রদান করিয়া যান। অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচার করিবার উদ্দেশে কতিপয় ইউরোপীয় ও দেশীয় মহোদয়দিগের যত্নে ১৭৩৯ শকে (১৮১৭ খৃঃ অঃ) এই সোসাইটী সংস্থাপিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ঐ ব্যাকরণ উক্ত সোসাইটী দ্বারা অদ্যাপি প্রকাশিত হইতেছে। বোধ হয় ঐ ব্যাকরণ খানি বাঙ্গলা ভাষার তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যাকরণ। উহা ইংরেজি ব্যাকরণের রীতি অবলম্বন করিয়া লিখিত— উহাতে বাঙ্গলা ভাষা-শিক্ষার্থীদিগের অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় নিবেশিত আছে। ইংরেজিতেও তাঁহার ঐরূপ একখানি ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলাখানি ঐ ইংরেজিরই অনুবাদ।

রামমোহন রায়ের যে আর একটী মহতী শক্তি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ করা যায় নাই। তিনি অত্যুৎকৃষ্ট

গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত বোধ হয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়-নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগরাগিণী-সমন্বিত; অনেক কলাবতেরা সমাদর পূর্ব্বক উহা গাইয়া থাকেন।—বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

জনৈক নির্ব্বাসিতের উক্তি।

একি হে জলধি! আজ করি বিলোকন
কেন হে ভীষণভাব করেছ ধারণ?
এহেন চপল কেন তোমার হৃদয়
হইল, অপারসিন্ধু! বল এ সময়?
কেন হে তরঙ্গ-ভঙ্গী করে বার বার
করিছ আঘাত কূলে? হায় হে আমার
দুঃখ দেখে রত্নাকর! হয়ে কি দুঃখিত,
তোমার হৃদয় আজ হলো উচ্ছলিত?
নতুবা গম্ভীর তুমি বিদিত ভুবনে;
একি দেখি নীর-নিধি! কি ভাবিয়া মনে,
খেলিছ মত্তের মত এ হেন সময়?
জান না কি এ পাপীর চঞ্চল হৃদয়
হইত সুস্থির ভাই, করে দরশন
তোমার গভীর মূর্ত্তি; অভাগার মন
হেরিয়া তোমার ভাব হইত সরল;
সেই তুমি আজি কেন এরূপ চপল?

তুমি যদি ভুলিলে হে আপনারে ভাই!
বল তবে, হতভাগ্য কার কাছে যাই?
আপন পাপের ফল ভোগ করিবারে,
আছি এই জনশূন্য জলের মাঝারে;
নাহি হেথা সুত জায়া সান্ত্বনা করিতে
এহেন বিপদ কালে! নাহি কেহ দিতে
এক বিন্দু নেত্রজল আমার রোদনে;
মনের যাতনা মম থেকে যায় মনে।
যে দিকে ফিরিয়া চাই দেখি শূন্যময়;
উদাসে সতত কাঁদে পাপিষ্ঠ হৃদয়।
চাহি আমি বন পানে দেখি তরুগণ,
নতমুখে যেন সবে করিছে রোদন;
অভাগার দুখে যেন তারাও কাতর,
দাঁড়ায়ে রয়েছে সবে বিরস অন্তর।
চাহি আমি নিশাকালে গগন মণ্ডলে—
দেখি যেন সুধা-নিধি মম ভাগ্য-বলে,
হারায়ে শীতল কান্তি মলিন বদনে,
কাঁদিছে পাপীর দুখে বসিয়া গগনে।
চাহি আমি শোকভরে এদিকে যখন,
তখন তটিনীপতি! করি দরশন,
যেন তুমি এ পাপীর দুখেতে বসিয়া,
কূলে কূলে এ বারতা বেড়াও ঘুষিয়া।
দিবা অবসান কালে যবে দিনমণি
ধীরে ধীরে তব নীরে ডোবেন আপনি;
যবে বিহগের কুল তোমা পরিহরি,

যায় সবে নিজ নীড়ে কলরব করি ;
যবে সুখময়ী ধরা কুসুম-দশনে.
হাসেন মনের সুখে ; বিমল গগনে
খেলায় চাতক যবে হয় একতান,
আনন্দে মাতিয়া করে ঈশগুণ গান ,
এই হতভাগা শুধু একাকী তখন
আসে ভাই নীরনিধি ! করিতে রোদন
বসিয়া তোমার কাছে। সেহেন সময়ে
না হয় সুখের লেশ এ পাপ হৃদয়ে !
ছিলাম পরমসুখে। কেন পাপী মন
পড়িল লোভের ফাঁদে, হইতে মগন
অপার দুঃখের নীরে ? হায়রে দুর্মতি !
না ভাবিলি সে সময়ে এ সব দুর্গতি।
দারা, সুত, ভাই, বন্ধু, প্রিয় পরিবার
না পাইল তোর কাছে তিল অধিকার।
যে ধনের লোভে তুমি হয়ে জ্ঞান-হারা,
ভুলেছিলে অনায়াসে নিজ সুতদারা,
বল রে পাপিষ্ঠ মন বল রে এখন
কোথায় রয়েছে পড়ে সেই পোড়াধন !
এই যে জীবনমত নির্ব্বাসিত হয়ে,
রয়েছ জলধি মাঝে বিষণ্ণ হৃদয়ে,
এসেছে কি হেথা ধন বল রে অজ্ঞান,
তোমার দুঃখের বহ্নি করিতে নির্ব্বাণ !
স্থির হও রত্নাকর ! কর হে শ্রবণ
অভাগা বিনয়ে যাহা করে নিবেদন।

হায় কিছু দিন পরে জীবন আমার
হইবে বিলীন ভাই সমীপে তোমার।
ঐ যে কুটীর দেখ—আমার সমান
গলিত মলিন বেশ, করিবে প্রদান
উহা মম পরিচয় কিছু দিন তরে,
অবশেষে যাবে কিন্তু ধরার উদরে।
একটী মৃত্তিকারাশি থাকিবে ওখানে—
হায় রে সরে না কথা কি হবে কে জানে—
তুমি তো প্রবল সিন্ধু! হেথা চিরকাল
থাকিবে সমান ভাবে, সমান করাল।
যদ্যপি পথিক কেহ উঠে কি কখন
এই জনশূন্য তীরে, চিন্তাতে মগন
হইবে নিশ্চিত ভাই, ক'রে দরশন
আমার গৃহের শেষ, ভাবিবে তখন
দাঁড়ায়ে তোমার তীরে,—কে এখানে ছিল,
কিবা নাম, কোথা ধাম, কবে বা মরিল,
বলো হে তাহাকে তুমি রতন-আধার!—
"কিছু দিন ছিল হেথা এক দুরাচার;
পড়িয়ে লোভের ফাঁদে পাপ কর্ম্ম করে,
ছিল হেথা, কারাবাসে জীবনের তরে;
জানি না তাহার নাম, কোথা তার ঘর,
কেবা পিতা, কেবা মাতা, কেবা তার পর।
এই মাত্র জানি আমি দিবা অবসানে,
আসিত সে মৃদু-পদে আমার এখানে;
বসে এই তরুতলে করিত রোদন

রাখিয়া কপোল করে, ভাসিত বদন
যাও হে পথিক! যাও; কেন বারবার
জিজ্ঞাস দুঃখের কথা নেই অভাগার!
যাও তুমি নিজ গৃহে, প্রাণের কামিনী
আছে তব পথ চেয়ে বসে একাকিনী,
যাও তুমি নিজ গৃহে; ছুঁও না চরণে
ছুঁওনা মৃত্তিকা রাশি, কি জানি কেমনে
সঞ্চারিবে গুরুপাপ তোমার অন্তরে,
পাপ-অস্থি আছে তার উহার ভিতরে।"—নি-বি.

আরঞ্জেব।

মহারাষ্ট্রপতি (শিবজী) বিদায় হইলে বাদসাহ তদ্দিবসীয় রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন। আরঞ্জেব বাস্তবিক কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন, এবং দৈনিক কার্য্য সমুদায় সমাধা না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ নৃপালগণের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না। আপনিই সমুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উজীর ওমরা প্রভৃতি সকলে তাঁহার কার্য্য-সচিব মাত্র হইয়া ছিলেন। তাঁহার আহার বিহারাদিতেও অতি অল্প-কাল ব্যয় হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমখাসে এবং সন্ধ্যাসময়ে গোসলখানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতিদ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন

তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালতখানায় গিয়া কিরূপে ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশালায় যাইয়া ভৃত্যেরা স্ব স্ব নিয়োজিত কার্য্যে মনোযোগী আছে কিনা দর্শন করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে সৈন্যগণের কাওয়াজ দেখিয়া কাহার বা বেতন বৃদ্ধি, কাহার বা কর্ত্তন করিয়া গুণবানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এইরূপে তাঁহার সমুদায় দিবাবসান হইত। রাত্রিতেও তাঁহার অধিক নিদ্রা ছিল না। একটী নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পাণ্ডুলেখ্য সকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সেইস্থান হইতেই নির্ব্বাহিত হইত; অমাত্যেরা তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতেন না।

যে দিবস শিবজী আইসেন, সেই দিন রজনীতে আরম্ভেও একাকী ঐ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখিতেছেন না—তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—"রজনী গভীর হইয়াছে—এই সময় আমার দীনদুঃখী প্রজাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে—কিন্তু, আমি সকলের অধীশ্বর হইয়াও এক তিলার্দ্ধকাল বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাই না—চিন্তাজ্বরে নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। আমার চিন্তার শেষ নাই—বিরাম নাই—কিন্তু তাহার বিরাম হইয়াই বা কি হইবে?—ভাবি চিন্তা বিরহিত হইলে ভূতকালের দুষ্কৃত সমুদায়

স্মরণ হয়। যাঁহারা কখন পঙ্কিল পাপ পথের পথিক হয়েন নাই, তাঁহারাই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ন করুন—আমার পক্ষে নিরন্তর চিন্তাসক্ত থাকাই ভাল। মনুষ্য-জীবন সতরঞ্চ খেলার ন্যায়—ইহাতে যত ভাবনা করা যায় ততই সুখ, যত সাবধান হওয়া যায় ততই জিত হইবার সম্ভাবনা!—দেখ এমত ধূর্ত্ত শিবজীও আমার চাতরে পড়িল—সে মনে করিতেছে যে, আমি জয়সিংহের পত্র পাইয়াই তাহার গৌরব করিয়া বিদায় করিব—কি মূর্খ! 'জয়সিংহ'—'জয়সিংহ'—এই নামটা আমার অত্যন্ত কর্ণজ্বালাকর হইয়াছে—সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু যে উপকার করিতে পারে সে অপকারেও অসমর্থ নহে—আর কার্য্যসাধন হইয়া গেলে সেই সাধনোপযোগী উপায়েরই বা আবশ্যকতা কি?—কল পাড়া হইলে আকশীতে কি প্রয়োজন?—কিন্তু জয়-সিংহকে নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে? পিতা কাহাকে না পরাজয় করিয়াছিলেন?—আমারও ত পুত্র আছে—সে অত্যন্ত বশীভূত বটে—তথাপি অগ্রে সাব-ধান হওয়া বিধেয়—আর এক্ষণে কে বা আমার শত্রু কে বা মিত্র তাহাও জানিলে ভাল হয়”—এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল পরে আকাশে দত্ত-দৃষ্টি হইয়া কহিলেন “জয়সিংহ! সাবধান—এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই নষ্ট হইবে, আমার দোষ নাই।—পুত্র! তোমারও এই পক্ষ-চ্ছেদ করিলাম, আর কখন উড়িবার যত্ন করিও না।” এই বলিয়া বাদসাহ অতি সাবধানে আপন পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—“হে আত্মজ! তুমি

আমার একান্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটী বিষম শঙ্কটাবহ পরীক্ষা করিতে সাহস হয়, অন্য কোন পুত্রের দ্বারা হয় না। তোমাকে শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা করাইয়াছি; অধিক কাল গত হয় নাই, তোমার সাহস এবং আজ্ঞানুবর্তিতা পরীক্ষার্থ একটা ব্যাঘ্রের সহিত তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম, তুমি তাহাও করিয়াছিলে। আমি অনেক ক্লেশে এই ভারতরাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, যে পুত্র আমার সর্ব্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই রাজ্যাধিকারী করিয়া যাইব। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ বিবিধ গুণশালী হইয়াও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের দুর্গে জীবনাবশেষ করিতেছে—সাবধান! যেন তোমারও সেই দশা না হয়। তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সকল সেনাপতিদিগকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া কহিবে যে, আমি পিতার প্রতিকূলে বিদ্রোহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব। যে যে তোমার পক্ষাবলম্বন, করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অচিরাৎ আমার নিকট প্রেরণ করিবে। এই কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই জানিবে যে, আমার যাবৎ পরিশ্রমের ফল তোমারই ভোগ হইবে।"

বাদসাহ দুই তিনবার এই পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে, যদি পুত্র আমার মতানুযায়ী হইয়া চলে, তবে আমিও আপনার সকল শত্রু একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখন সত্য সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার মনন করিলে তাহা কর্ত্তাও বিশ্বাস

হইবে না—কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সে আপনার পক্ষ বলবান দেখিয়া এইবারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্ত্তব্য? প্রভুদিগের এই পরম দুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্যসাধন হয় না-হায়! যদি আমি স্বয়ং স্বহস্তে সমুদায় কার্য্যসাধন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎ এক দিক্ এবং আমি একলা এক দিক্ হইলেও বুঝি জয় হইত। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একজন অতি বিশ্বাসভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন—"তুমি এই পত্র লইয়া শীঘ্র বিজয়পুর প্রদেশে যাও—অতি সংগোপনে ইহা আমার পুত্রের হস্তে দিবে—পরে রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সেনানী বর্গ যখন পরামর্শ করিবেন, তখন নিকটে থাকিতে চাহিও, যদি পুত্র তোমাকে নিকটে থাকিতে দেন তবে তাহার তাম্বুলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইও-পরে সকলে যে সকল কথা কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার পুত্রের আদেশানুসারে যদি বিদ্রোহ করণে স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে একটী পান দিবে, সেই পানের মসলা এই"—আরঙ্গের এই বলিতে বলিতে ভৃত্যের হস্তে একটী কাগজের মোড়ক দিলেন এবং কহিতে লাগিলেন "যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয়সিংহের তাম্বুল-বাহকের সহিত আলাপ করিও—বুঝিয়াছ!" ভৃত্য হাস্য করিয়া নতশির হইল এবং বাদসাহের হস্ত হইতে পত্র ও পাথেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

গঙ্গাস্তুতি।

সুরশৈবলিনী নাম, হইয়া গো মোক্ষধাম,
ত্রিগুণের গুণ তুমি, একাধারে ধরেছ,
ছিলে ব্রহ্ম-কমণ্ডলে দ্রবময়ী গঙ্গা হলে,
কে পায় তোমার অন্ত, অনন্তরে তরেছ।
পতিত-পাবনী তুমি, পবিত্র করিয়া ভূমি
সগরের ধ্বংস বংশ, আসি উদ্ধারিয়েছ;
অধম করিতে ত্রাণ, ক্ষিতিতলে অধিষ্ঠান,
অপরূপা আনন্দে, অলকানন্দা হয়েছ।
গঙ্গাদেশে দিয়ে বাস, যে করে যে অভিলাষ,
তুমি তার সেই আশ, হেলায় পূরায়েছ;
আমি দীন কি কহিব, ও মহিমা কি জানিব,
যে কিছু জানেন শিব, তাঁরে জ্ঞান দিয়েছ।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত, সবে তব পদানত,
বিধিবে বিবিধ মত, জ্ঞানদান করেছ;
এমতি তব মহিমা, কে করিতে পাবে সীমা,
একবারে যমশঙ্কা, ডঙ্কা দিয়ে হরেছ।
তপ জপ যোগ বল, সকলি তোমার জল,
মরি কি অসংখ্য ফল, জীবেরে বিতরেছ;
কি ভাবে সপত্নী ভয়ে, কিম্বা কুতুকিনী হয়ে,
শিবশিরে আরোহিয়ে, শরীর সম্বরেছ।
ওগো সুরধুনি ধন্যে, ভকতবৎসল জন্যে,
তুমি মাগো জহ্নু-কন্যে, এই নাম লয়েছ;
ভগীরথে দিয়ে ছায়া, উদ্ধারিতে দগ্ধ কায়া
শতমুখী হয়ে দয়া, প্রকাশিয়া রয়েছ।

জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া, মহেশ-মোহিনী মায়া,
হয়ে গোদাবরী গয়া, অবনীতে এসেছ ;
ওগো শিব-প্রেমপাত্রী, জীবের কৈবল্য-দাত্রী,
মদনের মুক্তিকর্ত্রী, হয়ে মাগো বসেছ।—বাসবদত্তা।

অস্থায়িজগতে স্থায়িত্ব।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্য আসিল। ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার * নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবেন!

পুনরায় পর্ব্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পর্ব্বতদুর্গ একে একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পর্ব্বত-কন্দর ও নির্জ্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক কিন্তু নির্ভীক রাজপুতদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল ; ক্ষতি নাই ; প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন ; স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

যুদ্ধতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল, শত্রুসৈন্য আরও রাশীকৃত হইতে লাগিল ; ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর

---

* রাজপুতগণ ৩৬কুলে বিভক্ত, শিশোদীয়া তন্মধ্যে একটী। প্রতাপসিংহ মেওয়ারের অধীশ্বর ও শিশোদীয়া বংশাবতংস। ইহাঁর ন্যায় বীরপুরুষ ভারতবর্ষে তৎকালে আর ছিল না। প্রতাপ জীবিত থাকিতে মুসলমানেরা মেওয়ার জয় করিতে পারে নাই।

অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না—মেওয়ার বিজয় হইল না।

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী সুশিক্ষিত সৈন্য-তরঙ্গের ন্যায় মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল; নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না; মেওয়ার বিজয় হইল না।

প্রতাপ অনেক সময়ে পর্ব্বতকন্দরে ও নির্জ্জন গহ্বরে বাস করিতেন; মেওয়ারের মহারাজ্ঞী ও রাজপুত্র গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন; শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করিতেন, কখন বনাভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কখন বন্য-পশুর গহ্বরে লুকাইতেন। রাজপরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন; শীতে, গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্ব্বত ভিন্ন অন্য আশ্রয় পাইতেন না; কখন কখন ক্ষেত্রের 'মল' দূর্ব্বা ভিন্ন অন্য খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না; মেওয়ার বিজয় হইল না।

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে শ্রুত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রুত হইল, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলে জয় জয় রব করিতে লাগিলেন; যাঁহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

মহানুভব আকবর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদ্‌বর্গ চমৎকৃত হইলেন; দিল্লীর মনিমাণিক্য-বিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরিদ্র,

কন্দরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল।

পাঠক! এ উপন্যাস-কথা নহে; প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর বীরত্বকথার নিকট, উপন্যাস কথা কি ছার? কোন্ উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ইহা অপেক্ষা প্রকৃত দেশানুরাগ ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছ? ভারতবর্ষে প্রকৃত গৌরবের কথা স্মরণ হইলে উপন্যাস কথা কি অসার বোধ হয়? আর্জ্জুনির কথা কি অলীক বোধ হয়? প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা কর; তিনি সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্ত-কোটি লোকের* অধীশ্বর আকবর সাহের সহিত একাকী যুঝিয়াছিলেন! তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চ-বিংশ বৎসর অবিশ্রান্ত কন্দরবাসী ক্ষত্রিয় একাকী দেশ রক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন! পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়-কর কিন্তু উপন্যাস নহে। বিশ্বাস না হয় নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ কর; উটী আমাদিগের অসার লেখনী-নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহের পরমশত্রু আকবর সাহের রাজসভায় প্রধান সভাসদ্ খান্‌খানান্ সেই দরিদ্র হিন্দুকে উপলক্ষ করিয়া উটী লিখিয়াছেন।

"জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী,
"ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,
"কেবল মহৎনামের গৌরব নষ্ট হয় না।
"প্রতাপ ভূমি ও সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন.

"প্রতাপ মস্তক নত করেন নাই,

"ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই একাকী স্ব-জাতির মান রাখিয়াছেন।"—জীবন-সন্ধ্যা।

বিষপূর্ণ পাত্রহস্তে কৃষ্ণকুমারী।

স্বর্গীয় অমৃত ইহা কে বলে গরল!
সমুদ্র মন্থনে যাহা দেবতা সকল
উঠাইলা যত্ন করি। পিতার আদেশ
পালিবারে;—হলাহল স্মরিয়া মহেশ
মুহূর্ত্তেকে করি পান আহ্লাদ-অন্তরে,
দেখুন আমার কার্য্য দেবতা-নিকরে।
পরিণয় কালে নারী বসন ভূষণে,
স্ব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বিবিধ রঞ্জনে
রঞ্জে সুকোমল তনু। আমিও তেমন
পরিয়াছি চেল-বস্ত্র সুবর্ণ-রতন
সাধিতে পিতার আজ্ঞা! দেশের মঙ্গল
হয় যদি মোর হতে,—জীবন সফল
বিসর্জ্জি পরাণ করি সর্পবিষ পান,
মৃত্যু অন্তে যেন ঈশ স্বর্গে পাই স্থান।—চ. ক.।

চাণক্যের নন্দবংশোচ্ছেদ প্রতিজ্ঞা।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বেই রাক্ষস একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন এক জন কৃষ্ণবর্ণ কদাকার অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসনে বসিয়া আছেন; দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

মহাশয়, আপনাকে এখানে কে আনিয়াছে। চাণক্য কহিলেন, আমাকে শকটার মন্ত্রী নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছেন। রাক্ষস এই কথা শুনিয়া আপনার আনীত ব্রাহ্মণটীকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা শ্রাদ্ধীয় সভায় আসিতেছিলেন, রাক্ষস সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ, আমি আপনকার আদেশে ইঁহাকে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছি; কিন্তু শকটার একজন উদাসীন ব্রাহ্মণকে আনিয়া সেই আসনে বসাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বরণীয় হইতে পারেন না। কৃষ্ণবর্ণ শ্যাবদন্ত আরক্তনেত্র ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। অতএব এক্ষণে মহারাজের যে অভিরুচি হয় তাহাই করুন। মহানন্দ একতঃ অব্যবস্থিতচিত্ত ও শকটারের প্রতি তাঁহার চির-বিদ্বেষ ছিল, তিনি বিনা আদেশে একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণকে বসাইয়া স্বয়ং প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া দ্রুতগতি শ্রাদ্ধীয় সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং চাণক্যের তথাবিধ কুৎসিতাকার দর্শনে তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই একবারে শিখাকর্ষণ পূর্ব্বক আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। সভামধ্যে ঈদৃশ অপমান কেহই সহ্য করিতে পারে না। চাণক্য অত্যন্ত তেজস্বি-স্বভাব, রাজা তাঁহাকে যেমন উঠাইয়া দিলেন, অমনি তদীয় আরক্ত নয়ন ক্রোধে দ্বিগুণিত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, শিখা আলুলায়িত হইল। তখন তিনি ভূতলে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, রে দুরাত্মা মহানন্দ! তুই আমাকে যেমন নিরপরাধে

অপমান করিলি, তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইতে হইবে। অহে সভ্যগণ, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকিলে, আমার নাম চাণক্য শর্ম্মা, রাজা তোমাদিগের সমক্ষে নিরপরাধে আমার কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করিলেন, এই শিখা নন্দবংশের কালভুজঙ্গীস্বরূপ জানিবে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংস করিতে না পারিব ততদিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিল। চাণক্য এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সভ্যগণ রাজার ঈদৃশ গর্হিত ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া কিছু না বলিতে পারিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন।—মুদ্রারাক্ষস।

হিমালয় সন্নিধানে মেনকার উক্তি।

বিগত যামিনীকালে, মহীধর মহীপালে,
কহিতেছে মেনকা মহিষী,
উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি।
নিরখিয়া শুকতারা, চক্ষে বহে শতধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণ তারা,
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা,
নিদ্রাহারা নয়নের তারা!
দারুণ দুঃখের ভোগে, বিষম বিভ্রম যোগে
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর,
সে দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণ কায়,
হিম হয় হিম কলেবর।

আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিন তব,
অদ্রি দেহ আর্দ্র নহে স্নেহে,
এত দিন নন্দিনীরে, ভাসাইয়া দুঃখনীরে,
সুখে বসি রাজ্য কর গেহে!
মৈনাক সন্তান শোকে, শূন্যদেখি তিনলোকে
আলোকে আঁধার গিরিপুরী,
প্রবল প্রতাপ যার, সাগর-সলিলে তার,
মগ্ন হলো মোহন মাধুরি!
সবে এক সুকুমারী, তাহারে ভিখারী নারী
করিলে হে নিদয় পাষাণ,
আহা কন্যা গুণবতী, সরল প্রকৃতি সতী,
দুঃখানলে দহে তার প্রাণ!
দেখিলাম স্বপনেতে, বৃষ এক বাহনেতে,
ভিখারীর কোলে ভিখারিণী,
দীনা হীনা ক্ষীণাকায়ে, ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে,
ভূত প্রেত প্রেতিনী সঙ্গিনী।
অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই,
বিষধর বেণীর বন্ধন,
অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বাঘছাল কটিতে পিন্ধন।
অন্নাভাবে তনু শীর্ণ, গোধূলিতে সমাকীর্ণ,
তাম্রবর্ণ চাঁচর কুন্তল,
স্বর্ণ-শোভা হস্ত বর্ণে, বনফুলদল কর্ণে,
নাহি আর সুবর্ণ কুণ্ডল।—প্রভাকর।

ক্রীটদ্বীপ।

জলদেবতা আপন অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্হিতা হইলে পর, গগনলক্ষ্মী জলদমণ্ডলের সাগরগর্ভোত্থ উত্তাল-তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া ক্রীটদ্বীপের পর্ব্বতশ্রেণী অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন যূথমধ্যে বৃদ্ধ মৃগেরই বিশাল বিষাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্রত্য গিরি-সমূহ মধ্যে আইডা পর্ব্বতের উন্নত শিখর অনতিবিলম্বেই লক্ষিত হইল। ক্রীটদ্বীপ পরম রমণীয় স্থান, দর্শনমাত্র রঙ্গভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ক্রমে ক্রমে উহার উপকূল দেশ সুস্পষ্ট অবলোকিত হইতে লাগিল। সাইপ্রস দ্বীপের ভূমি যেমন অকৃষ্ট ও শস্যাদিশূন্য, ক্রীটদ্বীপের ভূমি সেরূপ নহে, উহা প্রজাগণের শ্রমবলে অত্যন্ত উর্ব্বর, বিবিধ শস্যে ও অশেষবিধ পুষ্পফলে অলঙ্কৃত।

অল্প পরেই ভূরি ভূরি পরম রমণীয় গ্রাম ও মহা-সমৃদ্ধ নগর সকল আমাদিগের নয়নগোচর হইল। সে খানে এমন ক্ষেত্রই দৃষ্ট হইল না যে, উহা কৃষীবলগণের শ্রমসূচক চিহ্নে অঙ্কিত নহে; একটী কণ্টকবৃক্ষ বা তৃণ লক্ষিত হইল না। ঐ দ্বীপের মনোহর শোভা সন্দর্শনে আমাদিগের অন্তঃকরণে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল; দেখিলাম, উপত্যকাপ্রদেশে বহু-সংখ্যক পশুযূথ চলিয়া বেড়াইতেছে; ক্ষুদ্রতরঙ্গিণীগণ নিরন্তর প্রবল বেগে প্রবহমান হইতেছে; মেষগণ পর্ব্বতের উৎসঙ্গদেশে স্বচ্ছন্দে শষ্প ভক্ষণ করিতেছে; ক্ষেত্র সকল অশেষবিধ শস্যে সুশোভিত ও পরিপূরিত রহিয়াছে;

ফলভরনমিত দ্রাক্ষালতা স্নিগ্ধ হরিৎ পল্লব দ্বারা পর্ব্বত গণের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে।—টেলমেকস।

বালকের মুখ।

তামসী নিশার শেষে দেখিয়া তপনে,
যত না আনন্দে বসে কল্পনা-নলিনী ;
গ্রহণান্তে তারাকান্তে নিরখি গগনে,
যত না প্রমোদে মজে চিত্ত-কুমুদিনী,
উছলে মানস মাঝে ততোধিক সুখ,
হেরি সরলতাধার বালকের মুখ।
সদা তথা খেলে হাসি মানস-মোহন,
শিহরিয়া মেঘে যেন বিজলী সুন্দর,
সদা তথা হতে ঝরে মধুর বচন,
সুধাকর হতে যথ সুধার নির্ঝর :
সে আননে প্রফুল্লতা সদা প্রকাশিত,
মনে লয় যেন পদ্ম চির-বিকশিত।
নাহি তথা চিন্তাজ্বর বিরাম-নাশক ;
নাহিক কলুষ তথা ধর্ম্ম শান্তি চোর ;
নাহি তথা দ্বেষ হিংসা, দুরন্ত দংশক
যথা সর্প সদা পর-অপকারে ভোর ;
না আছে ছলনা তথা, নাহি কুকৌশল ;
শোভে মাত্র নির্দ্দোষতা-কনক-কমল।
সে মুখের সুমধুর আধ আধ ভাষ,
শুনিলে আহ্লাদ যত উথলে হৃদয়ে ;
পারে কি কখন দিতে সেরূপ উল্লাস,

গাইয়া গায়ক [illegible]
অথবা কোকিল কুল বসন্তাগমে,
কিম্বা ভাল শ্লোকমালা গাঁথি কবিগণে?

শ্রীবনোদ্যান।

শোভা ও সামর্থ্য।

আমরা মনুষ্যহৃদয়ের কতকগুলি বৃত্তিকে শোভা বলি, এবং কতকগুলি ভাবকে সামর্থ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি। নম্রতা, কোমলতা, লজ্জা, প্রীতি ও প্রশংসাপ্রিয়তা—এ গুলির নাম শোভা; এবং সাহস পরাক্রম, অধ্যবসায়, অভিমান ও আত্মনির্ভর—এ গুলির নাম সামর্থ্য।—ব্রততী ও তরু, অথবা একাধারে প্রকৃতি ও পুরুষ।

যে সকল হৃদয়বৃত্তি শোভা বলিয়া অভিহিত হইল, সেগুলি স্বভাবতঃই তরলপ্রকৃতি এবং পরানুসারিণী ও পরমুখপ্রেক্ষিণী। নম্রতা বিনা [illegible] ই হইয়া পড়ে; কোমলতা দুঃখদুর্ভাগ্যের কিঞ্চিন্মাত্র সন্তাপেই উনিয়া যায়, লজ্জা পরকীয় চক্ষুর সংস্পর্শে আসিলেই সংকোচে জড় সড় হয়; প্রীতি পরের স্কন্ধে [illegible] ভর করিয়া থাকিতেই ভাল বাসে; এবং প্রশংসাপ্রিয়তা সতত পরের দিকেই চাহিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল ভাব সামর্থ্য নামে উল্লিখিত হইল, সেগুলির সমস্তই ইহার বিপরীত। সাহস প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় স্বভাবতই স্বকীয় তেজে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে, পরাক্রম পর্ব্বতকেও তুচ্ছ বলিয়া গণনা করে না; অধ্যবসায় পুনঃ পুনঃ পতিত [illegible] অভিমান

প্রশংসা ও অপ্রশংসার প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া অসহায় অগ্রসর হইয়া যায়; এবং আত্মনির্ভরের ভাব অশেষবিধ যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইয়াও আপনার বলে আপনি অটল রহে।

এই শোভা ও সামর্থ্যের শুভ পরিণয়েই মনুষ্য-প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ত্তি। নহিলে, মনুষ্য অর্দ্ধবিকশিত অথবা অবিকশিত প্রাণীমাত্র। যে পুরুষ পরের দুঃখে একবিন্দু অশ্রুনিক্ষেপ করিতে পারে না, প্রণয়ভরে এক বারও পরের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া প্রেমরূপ অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুধার স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয় না, যাহার চিত্ত প্রকৃতির অনন্ত-বিস্তারিত সৌন্দর্য্য-সলিলে এক মুহূর্ত্তের তরেও নিমজ্জিত হইয়া মনুষ্যলোকেই দেবলোকের সুখানুভব করে না এবং যে আপনার স্বার্থ, আপনার মান এবং আপনার ক্রোধরক্ষার সময়ে অন্যের সুখ দুঃখ ও মনোবেদনাকে গণনাতেই আনিতে চায় না, তাহার পৌরুষে ধিক্। ঈদৃশ পুরুষকার অস্থিপঞ্জরময় দেহের ন্যায়! ইহাতে রক্ত নাই, মাংস নাই, এবং দেখিয়া সুখী হইবার কিছুই নাই। অথবা ইহা নির্জ্জল অন্নের ন্যায়, ক্ষুধার সময় ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, কিন্তু তৃষ্ণা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া যায়; প্রাণ মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধীভূত হইয়া অবশেষে ভস্মে পরিণত হয়। ইহা ব্যাঘ্র মহিষের আশ্রয় হইতে পারে, দৈত্যদানব এবং অসুরাদির কিয়ৎ পরিমাণে উপযুক্ত হয়; কিন্তু কোন প্রকারেই মনুষ্যের আভরণ ও প্রার্থনীয় অবলম্বন হইতে পারে না।—বান্ধব।

নক্ষত্র।

অন্তরীক্ষ বাসী ওহে নক্ষত্র মণ্ডল,
কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন?
মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ বরণ উজ্জ্বল
কুবের ভাণ্ডারে যথা অসংখ্য রতন।
শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী-ভূষণ
কনকের ফুলরাশি—তাই কি তোমরা?
অথবা দীপের মালা সুরবালাগণ
জ্বালিয়াছে, আলোকেতে উল্লাস অন্তর?
শুনেছি ত্রিদিবে আছে নন্দন কানন,
মন্দার কুসুম-দাম শোভিত সে স্থান।
তোমরা কি পারিজাত লোচন-লোভন,
দেবেন্দ্র কামিনী কণ্ঠে যার বহুমান?
কিম্বা যথা মানস সরস ভূমণ্ডলে,
প্রসব সেরূপ সরঃ উর্দ্ধে শোভা পায়,
কম কুমুদের দাম তোমরা সকলে,
প্রদোষেতে প্রমোদিত উদিত উষায়?
কিম্বা ধার্ম্মিকের আত্মা তোমরা সকলে?
সুকৃতির ফলে স্বর্গে করেছ গমন,
নিশিতে উদয় হয়ে নীল নভস্তলে,
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য নরে করিছ জ্ঞাপন?
কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন?
জ্যোতির্ব্বিদ্ স্থানে আমি না লই সন্ধান;
বিজ্ঞানের যুক্তি যুক্ত যথার্থ বচন
কবি-কল্পনার কাছে না পায় সম্মান!

দৃষ্টির সহায় যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন,
চর্ম্মচক্ষে করিয়াছি আমি আবিষ্কার,
জানিয়াছি কে তোমরা উজল গগন,
নিশিতে নীরবে কিবা করিছ প্রচার।
বিশাল গগন-গ্রন্থে গ্রথিত সুন্দর,
উজ্জ্বল অক্ষর মালা নক্ষত্র-মণ্ডল,
পড়িলেই এই জ্ঞান লভিবেক নর,
বিশ্বপতি বিধাতার বিচিত্র কৌশল।
যাঁর হাস্য প্রকাশক কুসুমের দল,
সৌম্য ভাব ব্যক্ত যাঁর পূর্ণশশধরে,
যাঁর জ্যোতি প্রতিবিম্ব মিহির মণ্ডল,
তাঁহার মহিমা লেখা নক্ষত্র-অক্ষরে।—পদ্যপাঠ।

শকুন্তলার পুত্র দর্শনে দুষ্মন্তের খেদ।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এত উৎসুক হইতেছে। পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয় আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, যে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখ মধ্যে অর্দ্ধ বিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান

ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সর্ব্বশরীর শীতল করিব, পুত্রের অর্দ্ধ বিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব, অথবা অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচন পরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব, এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।—শকুন্তলা।

দয়া।

কিবা শোভা পায় মণি, রমণীর গলে,
কিবা শোভা পায় ধনী, পারিষদ্ দলে,
কিবা শোভা পায় শশী, গগন মণ্ডলে,
কিবা শোভা পায় অসি, বীর করতলে,
কিবা শোভা পায় ভৃঙ্গ, অমল কমলে,
কিবা শোভা পায় শৃঙ্গ, গিরিময় স্থলে,
কিবা শোভা পায় শিশু, জননীর কোলে,
কিবা শোভা পায় ইষু, সমর-হিল্লোলে,
কিবা শোভা পায় কেশ, সুন্দরীর শিরে,
কিবা শোভা পায় বেশ, সুন্দর শরীরে,
কিবা শোভা পায় হাস্য শিশুর অধরে,
কিবা শোভা পায় লাস্য, সভার ভিতরে,
কিন্তু পর দুঃখে যার, আঁখি ভাসে জলে,
তার সম শোভা আর, কি আছে ভূতলে?—কবিতাপাঠ

দুর্ভাগ্য।

দুর্ভাগ্য! সৌভাগ্য-দীপিকার একমাত্র প্রচণ্ড বেরক! সুখ চন্দ্রমার উৎপাত রাহুগ্রহ! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমার প্রচণ্ড আক্রমণ কাহারও অবিদিত নাই। এই চরাচর বিশ্ব-সংসার মধ্যে এমন কিছুই দেখা যায় না, যাহা তোমার করাল-নয়নের পথবর্ত্তী না হইয়া চিরদিন সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছে। আজ যে স্থল,—যে নগর অগণ্য হর্ম্ম্যমালায় বিভূষিত দেখা যাইতেছে,—জনমানবে পরিপূর্ণ হইয়া লোক-লোচনের সার্থকতা বিধান করিতেছে, কখন না কখন তোমার পাপ-নিশ্বাস-সংস্পর্শে তাহাই আবার ঘোর অরণ্যে পরিণত হইবে, অরণ্যও কালে ভীষণ সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া অগাধ জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইবে। তোমার পাপ-নয়ন কাহারও চিরন্তন সৌন্দর্য্য-দর্শনে সমর্থ নহে। পরের উন্নতি তোমার চক্ষের শূল,—অন্তরের বিষময় সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ। তুমি আজন্মকাল পরের সর্ব্বনাশেই শিক্ষিত হইয়াছ ও কিসে আপনার সেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, এই চেষ্টাতেই অহরহ ভ্রমণ করিতেছ। তোমার আশার ইয়ত্তা নাই—অবধিও নাই। কিসে তুমি সন্তুষ্ট হও, তাহা তুমিও জান না, অন্যে জানিবার সম্ভাবনা কি? তুমি আপন উন্নতির জন্য সতত ধাবমান, সততই সোৎসুক; কিছুতেই তোমার সন্তোষ নাই। জগতে এমন শোকজনক ব্যাপার কি আছে, যাহাতে তোমার হৃদয় ব্যথিত হইতে পারে? দয়া বা করুণা কি পদার্থ,—কোন্ উপকরণে নির্ম্মিত, অদ্যাপি বা

শতযুগান্তেও তোমার এই অন্ধ হৃদয় তাহা অনুধাবন করিতে পারিবে না! তোমার হৃদয় কঠিন—কঠিন,—কর্কশ পাষাণ বা লৌহ অপেক্ষাও কঠিন।—অপূর্ব্বকারাবাস।

দশরথের প্রতি কেকয়ী।

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচ কুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
বকুল কুসুম ফুল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহ চূড়ে?
কেন পদাতিক, হয় গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণ বেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলী দিতেছে চৌদিকে?
কেনবা নাচিছে নট, গায়িছে গায়কী?
কেন এত বীণাধ্বনি? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝর, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে?

কেন রঘু পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে? রঘুকুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে?
কোন্ রিপু হত রণে রঘুকুলরথী?
জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ
দিবে আজি? আইবড় আছে কি হে ঘরে
দুহিতা? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে।
কহ শুনি, হে রাজন; এ বয়সে পুনঃ
পাইলে কি ভাগ্যবলে—ভাগ্যবান তুমি
চিরকাল! পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রূপবতী নারীধনে, কহ রাজঋষি?
হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি!
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্ত কণ্ঠে আজি
কহিত "অসত্যবাদী রঘুকুল-পতি।
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে!
ধর্ম্মশব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে!
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নরবর; কিম্বা দিয়া চূণ কালি গালে
খেদাও গহনবনে! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক? লোকমাঝে কেমনে দেখাবে

ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্য-প্রিয়।
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজপদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত—ভারতরত্ন রঘুচূড়ামণি
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্ব কথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?
তিন রাণী তব রাজা! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি!
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যামহিষী
ভুলাইলা মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ পুরী
ভিখারিণী বেশে দাসী! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে

"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্ব্বজনে!
পথিকে গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!
পুষি শারীশুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী;—
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে, গাইবে তারা বসি বৃক্ষশাখে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গশৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লীবালদলে;
করতালি দিয়ে তারা গাইবে নাচিয়া—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি।
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যামহিষী,—

যুবরাজ পুত্র রায় ; জনক নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধু—একবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি !
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন ; প্রবেশিতে তব পাপ পুরে !—বীরাঙ্গনা।

শিক্ষক।

যাঁহার উপদেশবলে বলবীর্য্যহীন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার হিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, মৃৎপিণ্ডপ্রায় শিশু, বীর্য্যবান জ্ঞানালোক সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যাঁহার উপদেশবলে জন্মকালে সর্ব্ব জীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও মনুষ্য আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া পরে সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, যাঁহার উপদেশবলে মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া পরম পবিত্র প্রীতি প্রফুল্লান্তঃকরণে অনুক্ষণ নিরতিশয় সুখ সাগরে ভাসমান হইতে থাকেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য জগদীশ্বরের পরমাদ্ভুত সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্যকলাপ পর্য্যা-লোচনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য মহিমার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এক কালে বিমোহিত হইতে থাকেন, এবং যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ পূর্ব্বক অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় জন্মের সার্থকতা

সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই পরম পবিত্র দুর্লভ সুহৃত্তম শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, পূজ্যপা ও প্রেমাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? অনেক সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তি একরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে রাজ্য মধ্যে শিক্ষক না থাকিলে যত ক্ষতি হয়, ধর্ম্মোপদেশক যাজক না থাকিলে তত ক্ষতি হয় না; কারণ বয়োবৃদ্ধদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান অপেক্ষা শিশুদিগকে সদুপদেশ দানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপধায়ক।—শিক্ষা-প্রণালী।

শৈশব স্বপন

আজ কেন অকস্মাৎ
সুদূর শৈশব নিদ্রা হইল স্মরণ?
দারিদ্র্য অনল যার, হৃদে জ্বলে অনিবার;
সংসারের কার্য্যশ্রমে ক্লান্ত অনুক্ষণ;
ভয়ঙ্কর ঋণ দায় প্রতিবাদী শত্রু তায়
অস্থির উন্মত্ত প্রায় হয়েছে যে জন।
সে কেন দেখিল স্বর্গ সুখের স্বপন?

বহুদিন ঘন ঘটা,
দুর্য্যোগী গগন আর আঁধার ধরণী—
যে জন দেখেছে হায়। ক্ষণস্থায়ী চপলায়
কি সুখ! তাহার মাত্র ধাঁধে আঁখি মণি
যে পথিক দিক্ ভ্রমে, নিদারুণ পরিশ্রমে
প্রান্তরেতে ক্লান্ত, তাহে তমিস্রা রজনী,
আলেয়া প্রভারে তারে কেন তা না জানি।

হায়! সে সুখের দিন
সময়-সাগর গর্ভে হয়েছে মগন।
নাই সে অবস্থা আর, নাই সঙ্গী খেলিবার,
নাই জননীর কোল—স্বর্গ সিংহাসন
বসন্ত কুসুম রাশি, শরদের পূর্ণ শশী,
মলয়ার বায়ু, গঙ্গাজল সম মন,
ছিল যে পবিত্র, এবে চিন্তার ভবন!

দুঃখাঘাত প্রতিঘাতে—
নহে তা কোমল কিসলয় সম আর!
নহেত পাষাণ মত, তা হলে ফাটিয়া যেত,
কি জানি কেমন তবে অন্তর আমার!
হৃদয়! কিসের তরে, বিষাদ সাগর নীরে,
ঢেলেছ পবিত্র মূর্ত্তি তুমি আপনার?
ক্ষুধা, তৃষ্ণা অবিতৃপ্ত আছে কি তোমার?

তাও নাই, তবে কেন—
যে সংসার ছিল মোর প্রমোদ উদ্যান।
ছিল শান্তি সুধাধাম, এবে তার পরিণাম,
শ্বাপদ সঙ্কুল ভীম গহন সমান?
হৃদয়ের প্রিয়তর, নয়নের প্রীতিকর,
কুসুমিত লতাকুঞ্জ ফলে নম্রমান
ছিল, তাও এবে বিষ-বল্লীর সমান!—ভু, প্রতিভা।

জানকীর দেহত্যাগ।

রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি, স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া, সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগ-সংবরণে সমর্থ হইলেন, এবং না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি আসন-পরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নৃপতিগণ, কোশলরাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরজানপদগণ সমবেত হইয়াছ, তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র অমূলক লোকাপবাদ-শ্রবণে চলচিত্ত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমি তোমাদের সকলকে এই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশস্তমনে অনুমোদন প্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, তদ্বিষয়ে, মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

ইহা কহিয়া, বাল্মীকি বিরত হইবামাত্র সভামণ্ডপে অতি মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, নৃপতিগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অকপট-হৃদয়ে কহিতেছি রাজা রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুনরায় গ্রহণ

করিলে, আমরা যারপরনাই পরিতোষ লাভ করিব। কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় লোক অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাম এতক্ষণ বিষম সংশয়ে কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতা-পরিগ্রহ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি নাই। এজন্য তিনি নিতান্ত ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণ প্রায় হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, স্থিরনয়নে বাল্মীকির মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি, অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া, উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার চরিত্রবিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়া আছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই, অতএব তুমি, সর্ব্বসমক্ষে পতিব্রতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়া, সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপনয়ন কর। সীতা বাল্মীকির দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র, বজ্রাহতপ্রায় গতচেতনা হইয়া, প্রচণ্ড বাতাহতলতার ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইলেন।

জননীর তাদৃশ দশা দর্শনে অতিমাত্র কাতর হইয়া, কুশ ও লব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাম, অতি মহতী লোকানুরাগপ্রিয়তার সহায়তায় এ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া, এবং কুশ ও লবের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, অতি দীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, হা প্রেয়সি! বলিয়া মূর্চ্ছিত ও সিংহাসন হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, হা বৎসে

জানকি! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতার ভগিনীরাও দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, চিত্রার্পিতের প্রায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াও, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের চৈতন্য-সম্পাদনে তৎপর হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁহার চৈতন্য হইল। বাল্মীকিও সীতার চৈতন্য-সম্পাদনের নিমিত্ত, অশেষবিধ প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরল-হৃদয়া ছিলেন, তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখন কাহার দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতাগুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্ম্মে উপদেশ দিবার নিমিত্ত, সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিয়া, কখন কোন কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।—সী-ব।

নির্ব্বেদ।

একাকী এসেছ মন! একাকী যাইবে,
প্রেমাস্পদ পরিজন পড়িয়া রহিবে,
জান যদি মায়াময় মিছে এ সংসার,
তবে বৃথা কর কেন আমার আমার!

কোথা রবে ধনধান্য রজত কাঞ্চন,
কোথা রবে হয় হস্তী শোভন ভবন,
কোথা রবে প্রিয়পত্নী প্রণয় ভাজন,
কোথা বা রহিবে সুত যতনের ধন,
কোথা রবে পরিচ্ছদ বিচ্ছেদে তোমার।
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার!

সর্ব্বোপরি প্রিয়তর দেহ অসংশয়,
"কুশাঙ্কুর ঘাত যাহে কখন না সয়."
পলালে পরাণ পাখী পিঞ্জরের প্রায়,
পড়ে রবে পথে, কিবে কে দেখিবে তায়,
সেইক্ষণে বন্ধুজনে করি হায় হায়,
এত যতনের দেহ দাহিবে চিতায়।
সে দিনের কত দিন বাকি আছে আর,
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার!

যেমন পথিকগণ পথিক-নিবাসে,
যামিনী যাপন করে হাস্য পরিহাসে,
ঊষাকালে যায় চলে যথা ইচ্ছা যার,
তাহাদের সনে দেখা নাহি হয় আর,

তেমন জানিবে সব স্বজন তোমার,
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার!

ছিলনা আলাপ আগে স্বজনের সহ,
অবশ্য হইবে ভবে উভয় বিরহ,
তবে ক্ষণ-পরিচয়ে কেন মুগ্ধ রও,
অরে মন! সর্ব্বজনে সমদৃষ্টি হও,
জান যদি মনে মনে সংসার অসার,
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার!—

কবিতাকুসুমাঞ্জলি।

মেঘ।

আমি বৃষ্টি করিব না। কেন বৃষ্টি করিব? বৃষ্টি করিয়া আমার কি সুখ? বৃষ্টি করিলে তোমাদের সুখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কি?

দেখ আমার কি যন্ত্রণা নাই? এই দারুণ বিদ্যুদগ্নি আমি অহরহ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। আমার হৃদয়ে সেই সুহাসিনীর উদয় দেখিয়া তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শমাত্রে তোমরা দগ্ধ হও। সেই অগ্নি আমি হৃদয়ে ধরি! আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন হৃদয়ে ধারণ করে?

দেখ, বায়ু আমাকে সর্ব্বদা অস্থির করিতেছে। বায়ুর দিগ্বিদিক্ বোধ নাই, সকল দিক্ হইতে বহিতেছে। আমি যাই জল-ভারে-গুরু তাই বায়ু আমাকে উড়াইতে পারে না।

তোমরা ভয় করিও না, আমি এখনই বৃষ্টি করিতেছি। পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। আমার পূজা দিও।

আমার গর্জ্জন অতি ভয়ানক—তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মন্দগম্ভীরে গর্জ্জন করি, বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া মৃদুগম্ভীর গর্জ্জন করি, তখন ইন্দ্রের-হৃদয়ে মন্দার-মালা দুলিয়া উঠে, নন্দস্নুর্শিরকে শিখ-পুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্ব্বত-গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। আর বৃত্রনিপাত কালে, বজ্রসহায় হইয়া যে গর্জ্জন করিয়াছিলাম সে গর্জ্জন শুনিতে চাহিও না—ভয় পাইবে।

বৃষ্টি করিব বৈ কি! দেখ কত নবমৃল্লিকাদাম, আমার জল-কণার আশায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আছে। তাহাদিগের শুভ্র, সুবাসিত, বদনমণ্ডলে স্বচ্ছ বারিসেক, আমি না করিলে কে করে?

বৃষ্টি করিব বৈ কি! দেখ তটিনীকুলের দেহের এখনও পুষ্টি হয় নাই। তাহারা যে আমার প্রেরিত বারিরাশি প্রাপ্ত হইয়া, পরিপূর্ণ হৃদয়ে হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, কল কল শব্দে উভয় কূল প্রতিহত করিয়া, অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছে, উহা দেখিয়া কাহার না বর্ষিতে সাধ করে?

আমি বৃষ্টি করিব না। দেখ, ঐ পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে কলসী পুরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং "পোড়া দেবতা একটু ধরণ করে না" বলিয়া আমাকেই গালি দিতেছে। আমি বৃষ্টি করিব না।

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পড়িতেছে বলিয়া আমায় গালি দিতেছে। নহিলে সে কৃষক কেন? আমার জল না হইলে তাহার চাস হইত না—আমি তাহার জীবনদাতা। জন্য, আমি বৃষ্টি করিব না।

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক, সেখানে আমি স্তুতি করিব না কেন?

আমি অতি ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকার কৃষ্ণকরাল রূপ ধারণ করি, তখন আমার ভ্রূকুটি কে সহিতে পারে? এই সে আমার হৃদয়ে কালাগ্নি বিদ্যুৎ, তখন পলকে পলকে ঝলসিতে থাকে। আমার নিশ্বাসে, স্থাবর জঙ্গম উড়িতে থাকে; আমার রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিম গগনে, সন্ধ্যাকালে লোহিত ভাস্করাঙ্কে বিহার করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করি, তখন কে না আমায় দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্না-পরিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ করিয়া, কেমন মনোমোহন মূর্ত্তি ধরিয়া আমি বিচরণ করি। পৃথিবীবাসিনীগণ! আমি বড় সুন্দর, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও।—বঙ্গদর্শন।

আক্ষেপ।

হায় পতিত পাবন!
কেন নিরমিলে ধরা দুঃখের কারণ:
তব সৃষ্ট জীবদলে, ভাসিতে নয়ন-জলে
দেখিতে কি হও নাথ আনন্দে মগন!
তুমি ইচ্ছাময় নাথ!
মুহূর্ত্তে সৃজিতে পার সুখের সদন।
তবে নাথ কেন হায়, কি বিবাদে পুনরায়,
করিলে এমন সৃষ্টি দুঃখের কারণ?

তোমারি কৃপায় নাথ!

আসে মনোহরা উষা ত্রিদিব-সুন্দরী;

শ্রীঅঙ্গে কুসুম পরি, হেম থালা করে করি,

গলে মৃদু চারুতম লাবণ্য-লহরী।

তোমারি কৃপায় নাথ!

মনোবিনোদিনী সন্ধ্যা দেয় দরশন,

বিহঙ্গ কাকলী গায়, বহে সুরভিত বায়,

নীলাম্বু গরভে দূরে স্তিমিত পবন।

তোমারি কৃপায় সেই

বরষার কালে ঘন গরজে মধুর,

নব কাদম্বিনী মাঝে, চারু সৌদামিনী সাজে,

আবার বিপিনে নাচে প্রমত্ত ময়ূর।

তোমারি কৃপায় হেরি

উজলিয়া নিরমল সুনীল গগন,

সুখদ শরত কালে, ভূষিত তারকাজালে,

রজত নবেন্দু ছটা নয়ন-নন্দন।

আবার বসন্ত কালে

বিকশিত ফুলজালে কানন-বল্লরী,

কুসুম-কানন হাসে, নব শোভা পরকাশে,

কোকিল-কাকলী বনে—অমৃত-লহরী।

অনন্ত অচিন্ত্য তুমি!

তব ইচ্ছাধীন এই বিশ্ব চরাচর,

তুমি নাথ ইচ্ছাময়, তুমি সর্ব্ব গুণময়,

তবে কেন মহীতল দুঃখের আকর!

তব ইচ্ছা হলে নাথ!
হইত এ ভূমণ্ডল চির সুখময়,
অশ্রুজল হাহাকার রব উঠি অনিবার
ফাটাত না দিবানিশি গগন-নিলয়।
হায় এই ভূমণ্ডলে
কেহ বসি যামিনীতে তরুর তলায়
ভিজায় নয়ন নীরে, বসুমতী জননীরে,
তাপিত কাতর প্রাণ দুঃখের জ্বালায়।
কত শত হতভাগা
নিরন্তর পরিশ্রমী বিদগ্ধ জীবনে,
বিশুষ্ক মলিন মুখ, দুঃখে বিদরিছে বুক,
ভাবিতেছে দুঃখ বন্ধ—অদৃষ্ট বন্ধনে।
আবার কোথাও মরি
কাঁদিতেছে পাগলিনী অভাগী জননী,
এলো থেলো বেশে হায়, ধুলি ধূসরিত কায়,
হারাইয়া প্রিয়তম নয়নের মণি।
দুঃখময় পৃথ্বী নাথ!
যোগীন্দ্র চিন্ময় কিবা রাজ রাজ্যেশ্বর
কিবা রাজ প্রণয়িনী, কিবা পথ কাঙ্গালিনী,
কিবা কুলবধূ নব কুসুমের থর।
সকলে সমান দুঃখী
কেহ কাঁদে বসি রত্নহৈম-সিংহাসনে,
কেহ বা ধরণীতলে, অন্নের জ্বালায় জ্বলে,
নিরাশ আশায় কেহ মনের বাগুনে।

দুঃখময় ধরাতল

দুঃখের মানব জন্ম, সংসার মায়ায়
বাঁধা আছে নিরন্তর, আজীবন দুঃখকর,
বিদ্যুৎ প্রতিম সুখ অচিরে লুকায়।

তুমি ইচ্ছাময় নাথ!

তোমার সৃজিত এই সুনীল গগন,
শোভাময়ী বসুন্ধরা, মানবের মনোহরা
তারা কিরীটিনী নিশি তোমারি সৃজন।

হায় এই ধরাতল

রজতের হার যার শ্যামল গলায়,
হ'ত কত মনোহর, হ'ত কত সুখকর,
কাঁদিতে না হ'ত যদি দুখের জ্বালায়!—দুঃখসঙ্গিনী।

বনবাসে রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ।

তাঁহারা দেখিলেন, কুটীরের সম্মুখে মহাসার সুবর্ণপৃষ্ঠ প্রকাণ্ড কোদণ্ড লম্বমান রহিয়াছে, দিবাকর তুল্য দেদীপ্যমান তূণমধ্যগত বাণ সকল ভুজঙ্গ-ফণার ন্যায় শোভা পাইতেছে; কাঞ্চন ভূষিত বিচিত্র গোধাঙ্গুলিত্র সমুদায় সজ্জিত রহিয়াছে; রৌপ্য-কোষ নিহিত ভীষণ খড়্গদ্বয় বিলম্বিত রহিয়াছে, বোধ হয় যেন অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিপক্ষদিগকে কুটীরের সন্নিহিত হইতে নিবারণই করিতেছে। বস্তুতঃ মৃগেন্দ্র গুহা মৃগকুলের যেরূপ ভয়ঙ্কর, ঐ পর্ণশালাও শত্রুকুলের পক্ষে তদ্রূপ ভীষণই ছিল। ভরত অস্ত্র পরিচয়ে, ঐ কুটীরে রাম অবশ্যই আছেন স্থির সম্ভাবনা করিয়া মহানন্দে সমধিক দ্রুতপদে চলিলেন, কিঞ্চিৎ অগ্রসর

হইয়া দেখিলেন, কুটীরের অভ্যন্তরে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, কুণ্ডসমীপে, পরিধান চীরবল্কল, গাত্রে কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম, মস্তকে জটাভার, মহাযোগী মহাবাহু রাম আসীন রহিয়াছেন, সীতা ও লক্ষ্মণ উভয় পার্শ্ব অলঙ্কৃত করিতেছেন। ভরত রামের এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাব বিলোকনে শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। বলিতে লাগিলেন, হায়! যিনি বহু-মূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রকৃতিগণে ও ধনিজনে পরিপূর্ণ রাজসভা মধ্যে বহু সিংহাসনে আসীন থাকিতেন, সেই মহাত্মা মহামহিম রাম আজ সীতা ও লক্ষ্মণ মাত্র সহায়ে, বল্কল ও অজিনমাত্র পরিধানে, দুর্গম গহন মধ্যে ভূম্যাসনে বসিয়া রহিয়াছেন! আহা! সাগরান্ত বসুধার অধীশ্বর হইয়া তিনি আজ বন্য ফল-মূলে প্রাণ ধারণ করিতে-ছেন! হায়! রামের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা শুদ্ধ এই নরা-ধমের নিমিত্তই হইয়াছে! এ নৃশংস জীবনে ধিক্! ভরত এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে কুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া, "আর্য্য" এই শব্দটী সকৃৎ মাত্র উচ্চারণ করিয়া শোকে অভিভূত ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন। শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র ও গুহক অনুপদেই উপস্থিত হইয়া রামের চরণ বন্দনা করিলেন। রাম আলিঙ্গন দানে অগ্রে তাঁহাদিগের তিন জনের অভ্যর্থনা করিয়া পশ্চাৎ সত্বর ভরতের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন।—রামের অরণ্যযাত্রা।

যমুনালহরী।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে! ও।
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নব অম্বর ও।
যুগ যুগ বাহি, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্বুদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।
কল কল ভাষে, বহিছে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি. মরম পরশে কথা,
ভুক্ত সে ভারত-কথা ও।
তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, যে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালে ও।
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজ ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
তব জল তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজ সিংহাসন ও।

শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
কভু শত ধারে, এ উচ্চ পাহারে,
পাঠান আফ্‌গান মোগল ও।
চালিল সেনা, জ্বালি নিশানী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও।
অহো! কি কুদিবসে, গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উন্নতি পালটি,
লুঠি নিল যা ছিল সার ও।
সে দিন হইতে, শ্মশানে ভারত,
পর-অসি ঘাত-নিপাতে ও।
সে দিন হইতে, অন্ধ মতে মূঢ়,
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত নারী,
অবরোধ অবরোধিত ও।
সে দিন হইতে, তব তট গগনে,
নূপুর নাদ বিলীন ও।

সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত বন্ধন ও।—গোবিন্দচন্দ্র রায়।

টোডরমল্ল।

ক্ষত্রিয় কুলাবতংস টোডরমল্লের মত সর্ব্বগুণ বিভূষিত বীরপুরুষ কখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রত্নপ্রসবিনী ভারত ভূমিতে অনেক পুণ্যাত্মা ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয়কুলে অনেক সময়ে অনেক বীরপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল সর্ব্বগুণে বিভূষিত ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা দিল্লীশ্বর আকবর সাহের সহিত পঞ্জাব গমন করিবার সময় দ্রুত ভ্রমণ বশতঃ তাঁহার কতকগুলি দেবপ্রতিমা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। টোডরমল্ল প্রাতঃকালে দেবারাধনা না করিয়া কোন কর্ম্মই করিতেন না, জলগ্রহণও করিতেন না। সুতরাং দেবপ্রতিমা নষ্ট হওয়াতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন কার্য্যই করিবেন না ও কয়েকদিন অনাহারে রহি-লেন। আকবরসাহ অনেক অনুরোধ করিয়াও কোন কার্য্য করিতে লওয়াইতে পারিলেন না। আবুল ফজেল প্রভৃতি আকবরের মুসলমান অমাত্যগণ টোডরমল্লকে "গোঁড়া" হিন্দু বলিয়া সতত্তই নিন্দাবাদ করিতেন, কিন্তু

মহানুভব দিল্লীশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। যখন টোডরমল্ল বৃদ্ধ হইলেন, যখন তাঁহার যশে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার পদ ও গৌরব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, তিনি সেই দর্প ও সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া গঙ্গাতীরে মানবলীলা সম্বরণ করিবেন এই অভিপ্রায়ে দিল্লীশ্বরের অনুমত্যনুসারে রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন। ফলতঃ তাঁহার অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ লোক ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে আর দেখা যায় না।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজা টোডরমল্ল সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। প্রথম বার মনাইম খাঁর ও দ্বিতীয় বার হুসেনকুলি খাঁর অধীনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই সাহসে দুইবারই জয়লাভ হয়। এমন কি প্রথমবার যখন কটকের যুদ্ধে মনাইম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, রাজা টোডরমল্ল অসম্ভব সাহস প্রকাশ করিয়াই জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার তিনি স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশ নহে, তিনি যে স্থানে যাইতেন, সেই স্থানেই অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুজরাট প্রদেশে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে টোডরমল্ল সিংহের মত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধোলকার যুদ্ধে সেনাপতি উজীর খাঁ পলায়ন তৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা টোডরমল্ল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী অগত্যা তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইলেন। আকবর সাহের অসংখ্য সেনাপতি ছিল, কিন্তু

ইহাদিগের মধ্যে টোডরমল্ল অপেক্ষা কোন সেনাপতিই বীরত্ব ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

আকবর সাহ সমস্ত ভারতবর্ষের রাজস্ব স্থিরীকরণ ভার টোডরমল্লের উপর ন্যস্ত করেন। সেই দুরূহ কর্ম্ম তিনি যেরূপে সম্পন্ন করেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধি ও রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ যে যে উপায় দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হিন্দুদিগকে পারস্যভাষা শিক্ষা দেওয়াই একটী প্রধান। রাজকর্ত্তাদিগের ভাষা শিখিলে শাসিতদিগের অবশ্যই উন্নতি হইয়া থাকে। এক্ষণে ইংরাজী শিখিয়া আমাদের যেরূপ উন্নতিসাধন হইতেছে, তৎকালে পারস্য শিখিয়া [illegible] সেইরূপ ফল হইয়াছিল।

রাজা টোডরমল্ল লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থাতেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা বিধবা [illegible] যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াও শিশুকে [illegible] পালন করেন। শিশুও অল্প বয়সেই [illegible] প্রকাশ করেন ও প্রথমে কেরানীর পদে নিযুক্ত [illegible] স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবশতঃ এই নীচকর্ম্ম হইতে [illegible] রত্নপরিপূর্ণ আকবর সাহের সভার মধ্যে প্রধানরত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।—বঙ্গবিজেতা।

হিমালয় শিখর।

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাশ

রঞ্জিত সুষমাময় প্রদীপ্ত তুষারচয়,

হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ ;
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান,
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে,
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্রসূর্য্য, পদে লুটে পৃথ্বিরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন ;
তুষারে আবরি শির, ছেলেখেলা পৃথিবীর,
ভ্রূক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন।
কত নদী কত নদ, কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন !
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে,
অবাক হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন।
চৌদিকে পৃথিবী ধরা নিদ্রায় মগন,
তীব্র শীত সমীরণে, দুলায়ে পাদপগণে,
বহিছে নির্ঝরে বারি করিয়া চুম্বন ;
হিমাদ্রি শিখর শৈল করি আবরিত ;
গম্ভীর জলদ রাশি, তুষার বিভায় নাশি,
স্থিরভাবে হেথা সেথা রয়েছে নিদ্রিত !
পর্ব্বতের পদতলে, ধীরে ধীরে নদী চলে
উপল রাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গ কুল সিক্ত করি বৃক্ষমূল
নাচিছে পাষাণ তট করিয়া প্রহত !
চারিদিকে কত শত, কল কলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা মাঝে নির্ঝরের ধারা !

আজি নিশীথিনী কাঁদে, আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।—বনফুল।

আমাদের শারীরিক বলবীর্য্য।

এবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, আমার পিতা ও পিতামহ বড় বলবান ছিলেন। সে কালের লোকের সহিত তুলনা করিলে, বর্ত্তমান লোকদিগের কিছুই বল নাই বললে হয়। আমি জানি, কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে একটা বাঘ আসিয়াছিল, সেই গ্রামের একজন ভদ্র ব্যক্তি তাঁহারই মত বলবান একজন নাপিতকে সঙ্গে লইয়া লাঠী হাতে করিয়া বাঘ মারিতে বেরুলেন। বিবেচনা করুন লাঠী দ্বারা বাঘমারা কতবড় সাহসের কর্ম্ম! তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল সর্ জন লরেন্স উত্তরপাড়ার স্কুলের বালকদিগকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সে কালের বাঙ্গালীদের তুলনায় একালের বাঙ্গালীরা নিতান্ত ক্ষীণ। চল্লিশ বৎসরে চাল্‌শে ধরে, ইহা সকলে জানেন। একজনকে আমি দেখিলাম, তিনি ভাল দেখিতে পাননা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের কি চাল্‌শে ধরেছে; তিনি বলিলেন, "না, পায়তারা ধরেছে;" অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। "এ বয়সে দৃষ্টির খর্ব্বতা হইলে, তাহাকে আর চাল্‌শে কেমন করে বলা যায়, পায়তারা বলিতে হয়।" কি আশ্চর্য্য! ইহার পর আমাদের দেশের লোকেরা কি সত্য সত্য বেগুণ গাছে আঁকুষি দিবে না কি? একশত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক জীবিত

ছিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমাদিগকে খর্ব্বকায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন সন্দেহ নাই। ছেলেবেলা সে কালের স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ডাকাইত তাড়ানোর গল্প সকল শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, পুরুষের এরূপ সাহসের কার্য্য শুনা যায় না। এক্ষণকার পুরুষেরা একটা শিয়াল তাড়াইতেও সক্ষম নহে। এই শারীরিক বলবীর্য্য হানির কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। সেই সকল কারণ নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। বাল্য বিবাহাদি যে সকল কারণ সেকাল একাল দুই কালে সাধারণ, তাহা এখানে ধরা গেল না। কেবল এই কালে যে সকল কারণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই ধরা গেল।—

(সেকাল আর এ কাল।)

ভগবতীসমীপে ইন্দ্রাদির প্রার্থনা।

"কি আর বলিব, মাতঃ, যে দুঃখেতে আছি,
বলিতে না সরে বাক্। কেমনে সরিবে,—
দুখের অর্গলে সদা রুদ্ধ বাক্ দ্বার।
মরমে মরিয়া মোরা আছি গো জননি!
দেখ বরুণেরে, বায়ু, অগ্নি আদি সবে
তেজোহীন; অহি যেন হিমের প্রভাবে,
দুর্দ্দান্ত দানব ডরে জড়সড় সবে!
মেলিতে না পারি গাত্র অসীম সংসারে
মোরা; সঙ্কুচিত হয়ে রব কত কাল?
অমর না হলে মাতঃ, ত্যজিয়া পরাণ

এড়াতাম এ যন্ত্রণা ! করিলে অমর
কেন ! কেনবা ইন্দ্রত্ব দিয়া স্বর্গরাজ্যে
এবে এ লাঞ্ছনা ? দিতে বিষম আঘাত,
উচ্চদেশে তুলে কিগো দিলা শেষে ফেলি ?
ইহাই কি ছিল মনে জগৎজননি ?
উগ্রচণ্ডা তুমি মাতঃ দানবদলনী ;
মহাকাল বিশ্বস্তব ; কোথা সে নামের
গুণ ? ত্যজেছ কি দোঁহে নিজ নিজ ধর্ম্ম,
মোদের দুর্ভাগ্য লাগি ? কোথা সেই শক্তি ?
(শক্তি তুমি.) কোথা সেই তেজ ? মন্দীভূত
এবে কি তা, সে শুম্ভের সৌভাগ্যের তেজে ?
মোদের লাঞ্ছনা দেখ তোমা বিদ্যমানে !
তব অনুগত মোরা ! আজন্ম সেবিয়া,
ও কমল পদ, শেষে এই হলো ফল ?
ভাসাইলে দুঃখ নীরে, অকূল অপার ?
তোমার আশ্রয় তবু লইলাম শেষে—
দেখি কি তোমার ধর্ম্ম ; বাঁচি কি না বাঁচি !
চঞ্চলা হইলা চণ্ডী ইন্দ্রের কথায় ।
ক্রোধে উলঙ্গিয়া অসি অমনি উঠিলা ।
বক্ষে করাঘাত করি কহিলা সরোষে,
"কার সাধ্য, কেবা স্পর্শে মম রক্ষ্য জনে—
হেন সাধ্য কার ? —অসি ধরিলাম এই
দৈত্যকুল কালরূপ ! কে নিবারে আমা ।
এখনি যাইব যুদ্ধে, এখনি সদর্পে
দৈত্যপতি দর্প খর্ব্ব করিব আহবে ।

দেখিব তাহার বক্ষে কতই সাহস,
বাহুদ্বয় কত বল ধরে বা তাহার।—দানবদলন।

সংসারের বিচিত্র গতি।

সংসারের এই গতি। এখানে কখন কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই মুহূর্ত্তে যে দৃশ্য পরমপ্রীতিপ্রদ ও সুন্দর দেখাইতেছে, পরক্ষণেই তাহা এমনি হইতে পারে যে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও ঘৃণা জন্মে। মনুষ্য এখনি আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া আশাহিল্লোলে নাচিতে নাচিতে উন্নতিস্রোতে বহিয়া চলিতেছে, পরক্ষণেই হয়ত কোন অদৃশ্য বিপদাবর্ত্তে পতিত হইয়া সংকটাপন্ন হইতেছে! সংসারের এই চিরন্তন নিয়ম। সংসারে কিছুই নিত্য নহে। কল্য প্রভাতে রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল রহিয়াছেন, সহসা প্রত্যূষে উঠিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজ্য বিনিময়ে তাঁহার নিমিত্ত চতুর্দ্দশবর্ষ বননির্ব্বাসন স্থির হইয়াছে। রাম রাজা না হইয়া বনবাসী হইলেন। পূর্ণগর্ভা জানকী স্বামীর নয়নানন্দদায়িনী হইয়া পরমানন্দে সময়পাত করিতেছেন, সহসা তাঁহার অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। রাম তাঁহারে বনবাস দিলেন দিগন্তবিজয়ী ত্রিলোকত্রাস দশানন আপনাকে অমরজ্ঞান করত অপ্রতিহত প্রভাবে যথেচ্ছাচরণ করিতেছেন, তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি সবংশে রামের হস্তে বিনষ্ট হইলেন। বাসববিজয়ী মেঘনাদ প্রাণোপমা পত্নী প্রমীলার নিকট হইতে রাম বিজয়ার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত

বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনি জানিতেন, জগতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সংস্কার বৃথা হইলে। আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল না! বারণাবতস্থ অমোঘ কৌশল-সম্পন্ন জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা দগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা মহানন্দে মগ্ন। রাজ্য লাভের নিমিত্ত তাঁহাদের এ সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। সেই পাণ্ডবদিগের হস্তেই তাঁহাদের জীবলীলার শেষ হইল। এইরূপ অনিশ্চিত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা সংসারে কখনই বিরল নহে। পৌরাণিক ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া দেখ, এতদ্রূপ ঘটনার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। লাহোরপতি অনঙ্গপাল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে সাহায্য ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনিপতি দেবদ্বেষী মামুদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার জয় স্থির-নিশ্চয় হইল। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন না। জয়ের পরিবর্ত্তে অনঙ্গপাল পরাজিত হইলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমবেত করিয়া দৃশদ্বতী নদীতীরে পটমণ্ডপ সংস্থাপন করত সগর্ব্বে বিপরীত পারস্থিত শত্রু গোরপতি মহম্মদকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু এ গর্ব্বের পরিণাম কি হইল? গোরপতি জয়লাভ করিলেন, দিল্লীশ্বর পরাজিত হইলেন। যৎকালে দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বিপক্ষ ইংরেজ-পক্ষ নায়ক সুচতুর ক্লাইবের সহিত স্বীয় সমরনায়ক মোহন-লালের অসামান্য যুদ্ধ চাতুর্য্য দর্শনে পটমণ্ডপ হইতে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন এবং স্বীয় জয়ের সন্দেহ না দেখিয়া আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেছিলেন না—এমন

সময়ে নীচাশয় নিস্তেজ মীরজাফরের প্ররোচনায় সেনা-পতিকে রণে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন, অমনি বিপক্ষেরা সজোরে প্রত্যাবৃত্তগণকে আক্রমণ করিল। বঙ্গের সৌভাগ্যসূর্য্য সেই দিনাবধি সম্পর্কশূন্য সুদূরস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ নিবাসী ইংরেজ জাতির আশ্রিত হইলেন। আর সরাজউদ্দৌলা এত আশা ভরসা করিয়াছিলেন, তাহারা কি হইল? শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। ইতিহাসে এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ কেহ বলেন, যে ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়া চলিতে পারে, তাহার বিপদ হয় না। আমরা একথা স্বীকার করি না। সময়ে সময়ে এমন দুজ্ঞেয় পথ অবলম্বন করিয়া বিপদ অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে যে, তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা মনুষ্য সাধ্যের অতীত।

পার্থিব পদার্থসম্বন্ধে ভবিষ্যতের উদরকন্দরে কি ব্যবস্থা নিহিত আছে তাহা কে জানে? তাহা জানিবার উপায় নাই এবং তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত অসম্ভব। সকল ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হইবার পন্থা থাকিলে সংসারে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইত। সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া যাবতীয় সুব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত।—মৃন্ময়ী।

নিদাঘ-জলদ।

সবিনয়ে বলি আমি, রাখ হে মিনতি,
সজল জলদ! ধর অচল মূরতি

শীতের সময় যাহা, বলেছিনু, ভুল তাহা,
দীনে দয়া করি ;
এবে বিপরীত আশা, এবে বিপরীত তৃষা
মনের ভিতরি
জেগেছে আমার, তাই কহি তব প্রতি,—
গতিহীন হও এবে, অগতির গতি।
সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে প্রাণ যায় যায়,
দয়ারে দহিয়া রবি আমারে জ্বালায় !
ঘর্ম্মের তরঙ্গ উঠে, পিপাসায় বক্ষ ফাটে,
গেল বুঝি প্রাণ !
জলধর ! এ সময়ে আতুরে সদয় হ'য়ে,
দয়া কর দান ;
কর দুটী যোড় করি নিবেদি তোমায়,—
বারেক দাঁড়াও তুমি তপন তলায় !
প্রকৃতির ছত্র তুমি, অহে পয়োধর !
প্রকৃতির আজ্ঞা তুমি পাল নিরন্তর।
তবে কেন চলি যাও ? থাম থাম মাথা খাও,
যেওনা চলিয়া ;
তুমি চলে গেলে মেঘ, সূর্য্যের অসহ্য বেগ
স'ব কি করিয়া।
আবার পুড়িবে মোর শরীর অন্তর,
দারুণ পিয়াসে কণ্ঠ হইবে কাতর !
কি চাও, জলদ ! তুমি—বল অচিরায় ?
থাকে যদি তা আমার—দিব তা তোমায়।

এবে মোর যা যা আছে, খুলিয়া তোমায় কাছে,
বলি একে একে ;—
আনন্দের লেশ হীন, দুর্ব্বল হৃদয় ক্ষীণ,
নিরাশায় ঢেকে
আছে বহুদিন হ'তে ; চাও যদি তায়,
লও তুমি—দিব আমি এখনি তোমায়।
আর যদি চাও তুমি আমার জীবন,
যে জীবনে যন্ত্রণার ভীষণ তাড়ন,
আশা যদি কর চিতে, প্রস্তুত তাহাও দিতে
এখনি তোমায়,
কিন্তু, হে জলদবর ! ক্ষণেক বিলম্ব কর
আকাশের গায়।
জীবন দিবার আগে জুড়াই জীবন
তোমার ছায়ায়, পরে করহ গ্রহণ।
ধনরত্ন নাহি মোর,—কি দিব তোমায় ?
যা আছে, তা বলিলাম—মন যদি চায়—
এখনি গ্রহণ কর, কিন্তু মোর বাক্য ধর,
দাতা জলধর !
বিনীতেরে দয়া করে, রবিস্থিতি কাল তরে
ছেড় না অম্বর।
সূর্য্য অস্ত গেলে, যবে ব'বে শীত বায়
তখন যাইও তুমি—বাসনা যথায়।—অ, স,

শোক।

শোক কি ? না স্মৃতির উপাসনা। এবং স্মৃতির উদ্বো-

দনাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব। মুহূর্ত্তের জন্য যে অনুরাগ, তাহা মানবজাতির অধস্তন জীবসমূহেই শোভা পায়,—মনুষ্যের শোভা পায় না। মনুষ্যের অনুরাগ অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে না পারিলে পরিতৃপ্ত হয় না,—সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রনিচয়ের সৃষ্টি ও বিলয়কেও পরিহাস করিয়া একবারে কালের সঙ্গে সমান রেখায় বহিতে না পারিলে, কৃতার্থ হয় না। এই নিমিত্তই মনুষ্যের জন্য মনুষ্যের শোক,—এবং এই নিমিত্তই শোকে মনুষ্যের এক অলৌকিক, অনির্ব্বচনীয়, অরুন্তুদ সুখ। যাহারা শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে সংসারের বৃথা কথা কহিয়া সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করে, আমার বিবেচনায় তাহারা হৃদয়-শূন্য। আর,—যাহারা বিবিধ নিষ্ঠুর নীতিসূত্র অথবা মমতার অনিত্যতা প্রভৃতি বিবিধ অর্থশূন্য বাক্য শুনাইয়া শোকাকুল হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে লোকান্তর-গত প্রিয়জনের প্রতিমূর্ত্তিখানি পুঁছিয়া ফেলিতে যত্নশীল হয়, তাহারা মূঢ়। আমার নিকট শোকের প্রতিকৃতি, সাধনার প্রতিকৃতির ন্যায়, যারপরনাই সুন্দর ও পবিত্র,— এবং শোকাকুলের দৃষ্টি সুধাবর্ষিণী। আমি আর্ত্তনাদকে শোক বলি না, এবং প্রিয়-বিচ্ছেদের প্রথম জ্বালাতে যে এক আচ্ছন্নতা জন্মে, তাহাকেও শোক বলিয়া ব্যাখ্যা করি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শোকের নাম স্মৃতির উপাসনা, এবং যে ঐ রূপ উপাসনার ভারে শোকাকুল, সে সার্থক-জন্মা। মনুষ্য যখন শোকে এইরূপ শান্ত, সুস্থির ও ধীর-প্রকৃতি হয়, তখন তাহার জন্য দুঃখ না হইয়া, প্রত্যুত তাহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মে,—এবং মনুষ্যের স্নেহ ও মনুষ্যের মমতা যে

নিতান্তই একটি কথার কথা, খেলার সামগ্রী অথবা মায়ার ছলনা নহে, ইহা অনুভব করিয়া মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধাতে হৃদয় তখন অবনত হইয়া পড়ে। যে সংসারে স্বার্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা, ক্ষতিলাভ-গণনাই মনুষ্যের একমাত্র শিক্ষা, এবং ভোগের আবর্ত্তচক্রই মনুষ্যের বিলাসক্ষেত্র, যদি সেই সংসারেও শোকের প্রকৃত সম্মান না হয়;—যে সংসারে প্রীতি প্রাতঃসূর্য্যের কিরণস্পর্শে বিকশিত হইয়া সন্ধ্যাগমেই শুকাইয়া যায়, মনুষ্যের মমতা সৈকত-ভূমিতে জলরেখার ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়, অনুরাগের তরঙ্গ বসন্তকালীন স্রোতস্বিনীর লীলাতরঙ্গের ন্যায় এই খল খল হাসিতে থাকে, এই আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই পুনরায় লীলাজলে বিলীন হইয়া যায়, যদি সেই সংসারেও স্মৃতির উপাসনা মনুষ্যচিত্তে সমুচিত পূজা না পায়, তবে জানিনা মনুষ্যের শেষ গতি কি?—বান্ধব।

মনোরাজ্য প্রয়াণ।

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ
সাগর সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত তপন;
স্বপন রমণী আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ।

সুকোমল চরণ কমল দুটি
ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি!
করে [illegible]ফুল, করে দুল দুল,
অলসিত অধরি যয়-আধো আধো ফুটি।

কবির শিয়রে গিয়া ধীরে ধীরে
ছুঁয়াইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে;
পরশের বসে, মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে।

অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়, অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে কাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা।

ছায়ারূপা রমণী সুযোগ ভাবি
কবির মনোমন্দিরে খুলি দিল রহস্যের চাবি;
দেখিতে দেখিতে, অমনি চকিতে,
আলোকের পথ দিয়া রথ এলো নাবি।

মনোরথ নাম তার, কামচারী;
আরোহিল তাকে কবি তন্দ্রার হইয়া আজ্ঞাকারী;—
অমনি বিমান, করে গাত্রোত্থান,
চালায় সারথী হয়ে, কল্পনা কুমারী।

কবিবর নাহি জানে কোথা যয়!
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময়!
কিছুকাল পরে, আকুল অন্তরে,
সারথিরে নিরখিয়া সম্বোধিয়া কয়।

"কোথায় গো সারথি! কোথায় যন্ত!
নাহি দিক্ বিদিক্ অগম্য শূন্য, হেথায় কি অন্ত!

কহিছ না কথা, এ কেমন প্রথা,
চাওগো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন ॥”

কিবা রাসগুচ্ছ বাগাইয়া ধরি
চাহিল কবির পানে, মনোরাস কাড়িয়া সুন্দরী
পরে গুণধরে, ফেলিল ফাঁফরে
“কি জিজ্ঞাসিতেছ” বলি মৌন পরিহরি।

কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা !
স্তব্ধ-পুলকিত-চ্ছবি কবিবর ! মুখে নাই ভাষা !
জিজ্ঞাসা যা কিছু পড়ি রহে পিছু,
হেরিতে বদন বিধু আঁখির পিপাসা !

কোথা গেল কবির বাক্যবিভব !
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া গেল মুহূর্ত্তে সে সব !
ভয় আনি কয় “স্বপ্ন এত নয় ?”
কবি কহে “স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব !”

“সেই চাঁদবদন সুধার ধ্বনি !
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী,
অকূল পাথারে ফেলিয়া আমারে
কোথা লুকাইয়া ছিলে বল মোরে ধনি !

কতকাল পরে আজি ভাগ্যোদয় !
পূর্ব্বে সে যখন তুমি দেখা দিতে, সে এক সময় !
জাগিছে সে সব, হৃদে অভিনব,
বহুদিনের বন্ধু যেন সে যতনের ন্যায় !

বেড়াতাম কত খুসিতে হাসিতে
আরেক না মনে হত, পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে।
শুধু জানিতাম, কলপনা নাম
নবনব সাজি সাজ, ছলিতে আসিতে।

"এখন আবার, একি চমৎকার!
রথ লয়ে আসিয়াছ সারথির ধরিয়া আকার।
অশ্ব—তেজে ভরা, মৃদু হস্তে ধরা,
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার!"

"যাইতেছ কোথায় তা বল শুনি,"
"মনোরাজ্যে যাইতেছি" হাস্যমুখে কহিল তরুণী।
শুনি মনোরাজ্য, করি শিরোধার্য্য
"লয়ে চল লয়ে চল" বলি উঠে গুণী।

"তোমাসঙ্গে তথায় না যাব যদি,
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব অবধি?
অই মম জপ, অই মম তপ,
অই দিকে ধায় সদা বাসনার নদী।

"মনোরাজ্য নামটী মধুতে ভরা!
ফুটে যথা পারিজাত বিচরে গন্ধর্ব্ব অপ্সরা;
দলি স্বর্ণরেণু, চরে কামধেনু,
কল্পতরু সুচারু ছায়ায় ছায় ধরা।

"মনোবাঞ্ছা পূরিবে তথায় গিয়া,
মিলিবে সে গুণনিধি সদা চিন্তা যাহার লাগিয়া।

ধরাতল রূপ ছাড়ি অন্ধকূপ
এইবার বাঁচিব নিশ্বাস ফেলাইয়া।”

কবিবর বচন কহিলে সাঙ্গ
স্বপ্নন। মধুর হাসি হার লয়ে হরিণ অপাঙ্গ।
শিথিল আশ্বাসে, লোল দিল শ্বাসে,
তেজে গরবিয়া উঠি ধাইল তুরঙ্গ।

মনোবাঞ্ছা ক্রমে হৈল সন্নিকট,
দূর হৈতে মনে লয় শোভে যেন চিত্র অক্ষপট!
গিরি নদী বন হর্ম্ম্য সুশোভন
স্তরে স্তরে শোভা করে দিগন্তের পট।

সম্মুখে তোরণদ্বার শক্রধনু:
ভিতরে সরসী হাসে চন্দ্রাভাসে পুলকিত তনু।
ঘন বনচ্ছায়, কজ্জলের প্রায়,
তীরে যথা নীরে তথা ভেদ নাহি অণু।—স্বপ্নপ্রয়াণ।

ডুবাল-চরিত্র।

এই মহানুভব ধর্ম্মাত্মা, জীবনের শেষদশা স্বচ্ছন্দে ও সম্মান পূর্ব্বক যাপন করিয়া ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, একাশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা ডুবালকে বিশেষরূপে জানিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই তাঁহার দেহাত্যয়-বার্ত্তা শ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন। এম ডি কোশ নামক তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার মৃত্যুর পর

উল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দুই খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। মাদমসল এনষ্টেশিয়া সোল্লফক নাম্নী সরকেশিয়া দেশীয় এক সুশিক্ষিতা যুবতী, দ্বিতীয় ক্যাথিরিণের শয়নাগার-পরিচারিকা ছিলেন। তাঁহার সহিত ডুবালের জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর যে লেখালেখি চলিয়াছিল, সে সমুদায়ও মুদ্রিত হইল। সকলে স্বীকার করেন, তাহাতে উভয় পক্ষেরই অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

ডুবাল কোন কালে পরিচ্ছদ পরিপাটির চেষ্টা করেন নাই। অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়, গ্রাম্যই ছিল। অতি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সামান্য রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। পরিচ্ছদ-পরিপাটি বিষয়ে তাঁহার যে এরূপ অনাদর ছিল, তাহা কোন ক্রমেই কৃত্রিম নহে। তাহার জীবনের পূর্ব্বাপর অবেক্ষণ করিলে, স্পষ্ট বোধ হয় যে, কেবল নির্ম্মল জ্ঞানালোক-সহকৃত ঋজুস্বভাববশতই এরূপ হইত। তিনি অতি দয়ালু-স্বভাব ছিলেন।

ডুবাল স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ হইয়াছিলেন। আর রাজসংসারে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিলে মনুষ্য-মাত্রই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও কুক্রিয়াসক্তির পরতন্ত্র হয়; কিন্তু তিনি তথায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি অতি দীর্ঘ জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও চরিত্রের নির্ম্মলতা বিষয়ে লোরেনে অবস্থান-কালের [illegible] পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার [illegible]

হীন অবস্থায় দুঃসহ ক্লেশ প্রপঞ্চমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সরল হৃদয়তা, যদৃচ্ছালাভ সন্তোষ, ও প্রশস্ত-চিত্ততা অন্তিম-ক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃতই ছিল।—জীবনচরিত।

জন্মভূমির প্রতি।

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে
এদেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে;—
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজনে,
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরাবতী আমি, কহ, গো শ্যামা জন্মদে।
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে।
ফুটে যেন স্মৃতিজলে;—মানসে, মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে।—মাইকেল মধুসূদন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পাঠকগণ। হরিশ্ বাবু কি ভাবে আপন প্রতি

অবস্থিতি করিতেন, আমি তোমাদিগকে তাহার এক চিত্র প্রদান করিলাম। ঐ দেখ! অত্যাচার পীড়িত প্রজাগণকে বিচারালয়ে যাইবার জন্য দরখাস্ত লিখিয়া দিতেছেন, আবশ্যক খরচের জন্য টাকা দিতেছেন, প্রবল লোকদিগের নিকট হইতে সাহায্য দেওয়াইবার উপায় করিতেছেন, এবং উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সদ্বিচার লাভে সমর্থ করিতেছেন। আবার ঐ দেখ, রোরুদ্যমান রাইয়তগণে তাহার বাড়ী কোলাহলময় করিযাছে, তিনি অবাক্ হইয়া তাহাদের দুঃখ-কাহিনী শুনিতেছেন, তাঁহার চক্ষু-জল রাইয়তের রোদনে উত্তর দিতেছে, তাহাদিগকে আপনার বিপন্ন ভ্রাতৃগণ মনে করিয়া পরম যত্নে আহারাদি করাইতেছেন এবং তাহাদিগের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দানের সংকল্প করিতেছেন। আবার এদিকে দেখ! নিরুপায় পরিচিত ব্যক্তিকে লইযা গিয়া নিস্তব্ধ ভাবে অর্থ প্রদান করিতেছেন, আপনার শরীর দিয়া পল্লীর অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাণ করিতেছেন, বিপদাপন্ন প্রতিবেশীর বিপদুদ্ধার বিষয়ে স্বকীয় সমগ্র ক্ষমতা নিয়োজিত করিতেছেন, অত্যাচারীর দণ্ড নিমিত্ত বিপুল সাহসে নির্ভর করিয়া যথোপযুক্ত যত্ন করিতেছেন এবং পীড়িত বন্ধুর শয্যায় বসিয়া সমদুঃখ অনুভব করিতেছেন।

তিনি মানুষোচিত কর্ত্তব্যে আত্মা ও মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। শেষে যে অবস্থায় আফিসের কার্য্য করিতেন—অপরে সে অবস্থায় শয্যাগত থাকে। এই অতিক্রমই তাঁহার মৃত্যুকে সত্বর আহ্বান করিয়াছিল! তিনি সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াও কি জন্য অবকাশ লয়েন নাই, মৃত্যু-

শয্যায় শয়ন করিয়া তিনিই তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। তাহা এই "আমি আমার উচ্চপদস্থ ইংরাজ প্রভুগণকে ইহা জানাইবার জন্য বিদায় লই নাই যে, বাঙ্গালীরাও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে।" নীলকর পীড়িত প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি কত কষ্টই ভোগ করিয়াছেন। এক দিকে নীলকর সাহেবেরা শাসাইতেছেন, আর দিকে আদালত হরিশের বিপক্ষে ডিক্রী দিতেছেন, অপর দিকে সম্বাদপত্র সকল তাঁহার নিন্দা ও গ্লানি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি অবিচলিত ও অশঙ্কিত চিত্তে নীল-প্রধান-প্রদেশের অত্যাচার মূলক সত্য বিবরণ সকল সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে তিনি আপন ব্যয়ে স্থানে স্থানে সংবাদ সংগ্রাহক পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার অন্তঃকরণ হিতময় ও একান্ত নিরহঙ্কৃত ছিল। অন্যের মন্দ হইয়া আমার ভাল হউক, তিনি এরূপ প্রার্থনা করিতেন না; কিরূপে অন্যের ন্যায় বড় হইব তাহাই ভাবিতেন। কি বিদ্যা, কি ধন, কি ধর্ম্ম তাঁহার কোন বিষয়েই আড়ম্বর ছিল না। লোকের প্রতি আশার অতীত সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বাস্তবিক যে প্রকার ছিলেন, ভাবভঙ্গী দ্বারা কখন কাহাকে তাঁহার অন্যরূপ দেখান নাই। তিনি জন্মভূমিকে জননীর ন্যায় দেখিতেন। যথার্থ দেশহিতৈষী তিনিই ছিলেন, কেমন করিয়া লোকের ভাল করিতে হয়, তিনিই জানিতেন।

তিনি যে কেবল রাজনীতি ও অপরের কার্য্য লইয়াই

ব্যস্ত থাকিতেন তাহা নহে, ধর্ম্মের আলোচনাতেও তাঁহার আস্থা ছিল। এত কাজের মধ্যেও ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য বক্তৃতা লিখিতেন এবং ঐ সভার উন্নতির নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও দুঃখীর হিতচিন্তায় নিবৃত্ত ছিলেন না। যখন শুনিলেন ষ্টেট সেক্রেটারী সর্ চার্ল্স্ উড্ রাইয়তের পক্ষে নীল মোকদ্দমার যথাযোগ্য মীমাংসা করিয়াছেন, তখন সেই মুমূর্ষু দশাতে আপনাকে সুখী বোধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় যেন এই কথা শুনিবার জন্যই সে অবস্থায় কয়েকদিন জীবিত ছিলেন। যখন শুনিলেন, তিনি গৌরবান্বিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, তখন আপনাকে চিরশান্তিতে সমর্পণ করিলেন।

নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম দোষে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে হরিশ বাবু পীড়িত হয়েন। ক্রমে সেই রোগ প্রবল ও বদ্ধমূল হওয়াতে এমন শয্যায় শয়ন করিলেন, যাহা হইতে আর উঠিলেন না। আহা! যে দিন হরিশ বাবু চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েন, যে দিন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসে বঙ্গভূমি পবিত্র হয়, যে দিন তাঁহার বিরহরূপ ভারতের ভূপরিহর ক্ষতি সংঘটিত হয়; সেই ১২৬৮ সালের ১৩ই আষাঢ় কি শোকাবহ।— চরিতাষ্টক।

কুল ব্রীটানিয়া।

প্রমোদ কানন, শোভার আধার,
বীরত্বের খনি, বিদ্যার ভাণ্ডার,

রত্ন আভরণা রাজেন্দ্রাণী প্রায়

শোভে শ্বেতদ্বীপ সলিল-শয্যায় ;

রাজবর্ত্মে বহে বাণিজ্যের স্রোত,

পোতাশ্রয়ে শোভে শত শত পোত

শাল বৃক্ষ সম গুণবৃক্ষ চূড়ে

সারি সারি কেতু ধীরে ধীরে উড়ে,

চতুর্দ্দিকে বায়ু ভ্রমিছে গাইয়া ;

"সাগরবাসিনী রুল ব্রীটানিয়া ।"

শত-স্বর্ণ-সৌধ-মালিনী লণ্ডন

টেমস্-সলিলে হেরিছে আপন

বিচিত্র চিত্রিত সুন্দর মূরতি,

যেন রূপবতী ষোড়শী যুবতী,

হীরক, মুক্তা, মণি, মাণিক্যে আদরে

সাজাইয়া দেহ গরবের ভরে

স্বচ্ছ দর্পণে হেরিছে বদন ;

বক্ষে সেই ছায়া করিয়া ধারণ

স্রোতঃ ছলে যেন নাচিয়া নাচিয়া

গায় স্রোতস্বতী,—"রুল ব্রীটানিয়া !"

শ্বেতদ্বীপ তব মহিমা অপার ।

দুর্জ্জয় জলধি পরিখা তোমার,

ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তব আজ্ঞাবহ,

বিদ্যুৎ তোমার দূতী অহরহ,

চতুর্দ্দিকে তব নীল বারি রাশি

মধ্যে, তুমি,—যেন স্বর্ণময় পদ্ম

শারদ অম্বরে—কিবা মনোহর।
তব পদ সদা চুম্বিছে সাগর ;
আপনি বরুণ তরঙ্গ তুলিয়া
গায় প্রতিদিন—"রুল ব্রীটানিয়া।"

দ্রুতগতি তরি করি আরোহণ,
হেলায় তরঙ্গে করিয়া দলন,
নির্ভীক নাবিক দূরদেশে যায়,
ব্রীটনের নামে দিগন্ত জাগায়,
প্রকাণ্ড মূরতি রণতরি ভরি
ব্রীটন-তনয় যুদ্ধ সজ্জা করি
চলে শত শত, ঝম্ ঝম্ ঝন্
'রুল ব্রীটানিয়া' বাজে অনুপম ;
দূর শৈলমালা আকাশে মিশিয়া·
করে প্রতিধ্বনি "রুল ব্রীটানিয়া!"
বীর অবতার ব্রীটন-তনয়
মহাবীর্য্যবান, কেশরি-হৃদয়,
তেয়াগিয়া সুখ, সংসারের মায়া,
পিতা, পুত্র, ভাই, প্রাণাধিকা জায়া,
স্মরি জন্মভূমি, স্মরি শেষবার
প্রিয়জন মুখ ;—বাজে বারংবার
ভীষণ বাজনা—প্রবেশে সমরে,
পদভরে ধরা টলমল করে,
বীরবক্ষে যেন বিদ্যুৎ চালিয়া
বাজে ঘোর রোলে—"রুল ব্রীটানিয়া!"

রত্নগর্ভা, শতবীর-প্রসবিনী,
ওয়েলিংটন ব্লেক নেল্‌সন-জননী
নীলের সমরে যে দিন নেল্‌সন
ভীম প্রসরণে করিল বেষ্টন
ফরাশীর সেনা; কাঁপায়ে মিশর,
কাঁপায়ে জলধি, মহা ভয়ঙ্কর
শত শত তোপ গরজি উঠিল,
গন্ধকের ধূমে জগত গ্রাসিল;
সেই অন্ধকারে রহিয়া রহিয়া
বাজিল গম্ভীরে—"রুল ব্রীটানিয়া!"

হতাশে বিষাদে আকুল হৃদয়,
সে কুলগ্নে নেপোলিয়ন দুর্জ্জয়,
—(যেন মুছিবারে ললাট-লিখন)
ওয়াটার্লুর ক্ষেত্রে আরম্ভিলা রণ,
দুই সৈন্যে ঘোর সংগ্রাম বাধিল,
সিংহে সিংহে যেন যুঝিতে লাগিল;
ঘোর ঝণাৎকার হেষা হোর্‌রা রবে
রণস্থল-বাসী সশঙ্কিত যবে,
প্রুশীয়-সঙ্গীত সহিত মিশিয়া
বাজিল সে দিন—"রুল ব্রীটানিয়া!"

হৈমবতী চারু-[illegible] কিরণে
যে দিন শোভিল পলাশী-প্রাঙ্গণে
সিরাজ সমক্ষে ইংরাজের বল;
ঘন ঘন করি ঘোর কোলাহল

বাজিল দামামা, শিঙ্গা, ঢাক, ঢোল,
উঠিল চৌদিকে ভয়ঙ্কর রোল,
গাড়ল মদন, কামান ধ্বনিল,
ইংরাজের জয় ঘোষণা করিল।
গভীর উচ্ছ্বাসে উঠিল বাজিয়া
বিজয়ী সঙ্গীত,—"রুল ব্রীটানিয়া!"

শুনি প্রতি দিন শুইয়ে শয্যায়
রুল ব্রীটানিয়া, সৈনিকেরা গায়;
রুল ব্রীটানিয়া, কোথায়? ভারতে?
আর্য্যের নিবাস এ আর্য্যাবর্ত্তে?
ভাবি মনে মনে বুঝি ঘুম-ঘোরে
স্বপন সুন্দরী প্রতারিছে মোরে;
পরক্ষণে, হায়, গরজিয়া উঠে
প্রাতঃকালিক তোপ; প্রতিধ্বনি ছোটে
দ্বিগুণ দাপটে দিক্ ডুবাইয়া
বাজে ঘন ঘন,—"রুল ব্রীটানিয়া!"
সূর্য্যবংশীয়ের সিংহাসনে আজ
ব্রীটানিয়া, তুমি করিছ বিরাজ;
আজি অযোধ্যায় কি শুনিছি হায়!
কোথা রঘুবীর! সৌমিত্রি কোথায়!
রাজ রাজপুরী আজ অন্ধকার!
মুছি নয়নের, হায়, শতধার,
চারি দিকে চাই, শূন্য সব ঠাঁই,
কোথায় এলাম, স্মৃতিরে সুধাই;

অমনি শুনিয়া উঠি চমকিয়া,
দুর্গে দুর্গে বাজে—"রুল ব্রীটানিয়া !"

দুরন্ত প্রতাপ ব্রীটন তোমারি,
তব নামে যেন কাঁপে চারি ধার।
হিন্দু রাজত্বের ভগ্ন শেষোপরি
মোগলের যেই অর্দ্ধশশী মরি
বর্ষ পঞ্চশত করিল বিরাজ,
অস্তাচলশায়ী সেই শশী আজ।
শীক রাজপুত, সবে ম্রিয়মাণ,
পাদ্য অর্ঘ্য দেয় নেপাল ভোটান !
নিয়তির গতি কে রাখে বোধিয়া ?
আর্য্য ভূমে বাজে—"রুল ব্রীটানিয়া !"—দীব

ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের তুল্য হতভাগ্য রাজ্য আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ধনবান গৃহস্থ, যেরূপ দস্যুগণের লক্ষ্যস্থল হয়, সেইরূপ এই রত্নশালী রাজ্য অভাবগ্রস্ত সকল জাতির লালসার বস্তু হইয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে মধ্য আসিয়ার কঠোরাঙ্গ ও কঠোরপ্রকৃতি দরিদ্র জাতীয়েরা বারম্বার এই রাজ্যে আসিয়া উপদ্রব করিয়াছে। তৎপরে গ্রীকগণ আক্রমণ করে, এবং তদনন্তর সাহেবুদ্দীন গোরি হইতে বাবরের সময়ের মধ্যে পাঁচবার এই রাজ্য বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসিগণের একতাব অবসান হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন বংশ, ভিন্ন ভিন্ন কুলমর্য্যাদা, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও পরস্পায় অনৈক্য ভাবাপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহার এই সমস্ত দুর্ব্বল অবস্থার গতিকেই বিদেশীয়েরা নির্ভয়ে ইহাকে আক্রমণ করে ও অধিকার করিতে সমর্থ হয়। যাবৎ ভারতের দুর্ব্বলতার এ সমস্ত কারণের অবসান না হইবে, তাবৎ ভারতের দুরবস্থারও অবসান হইবে না।—মনুষ্য জাতির আদিম বাসভূমি এই বিপুল ভারতরাজ্য তাবৎ কাল পর্য্যন্ত কতিপয় বিদেশীয়গণের শাসনাধীন থাকিবে। কিন্তু যদিও ভারতের রাজ্যতন্ত্র বিষয়ে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তথাচ তদ্দ্বারা ইহার আভ্যন্তরিক স্থৈর্য্যভাবের কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই। কত কত জেতৃগণ এই রাজ্য জয় করিয়াছেন, কত কত রাজবংশ সমূলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে তথাচ ভারতবাসিগণের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। সিকন্দর সাহার সময়ের হিন্দুগণের যে বর্ণনা পাঠ করা যায়, বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণের প্রতি তাহা সম্যক্‌রূপে সংলগ্ন হয়। ঈদৃশ স্থিরপ্রকৃতির সমাজবন্ধন, পণ্ডিতজনের আলোচনীয় বিষয়;—এস্থলে তাহার দোষগুণ বিবৃত হইবার নহে। সে যাহা হউক, এদেশের শুভাশুভ যাঁহাদিগের হস্তায়ত্ত, ইহার পূর্ব্বোক্তরূপ সমাজবন্ধনের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা এ দেশের শাসন না করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা।—রাজস্থানের ইতিবৃত্ত।

পূর্ব্বস্মৃতি।

এই কি সে দেশ আহা এই কি সে দেশ!—
সুন্দর নন্দনবন, সাহিত্যের খনি,
কল্পনার রঙ্গভূমি, বিনোদ ভাণ্ডার?
কবিতা নিকুঞ্জবনে দেবর্ষি যেখানে,
মাতিয়া গাহিত গীত অনন্ত সুস্বরে
ত্রিতন্ত্রী নিঃস্বন সহ, মূর্ত্তিমতী হয়ে
ছত্রিশ রাগিণী যথা রাগ তানে মিলি
আনন্দে করিত কেলী আপনা পাসরি,
প্রসারি অলকাধাম অমর-বাসনা।
কোথা সে অযোধ্যা আর্য্য গৌরবের ভূমি?
কবিগুরু বসি যার কুসুম-কাননে
কাব্যপারিজাত তরু রোপিলা কৌশলে!—
যার পুষ্প অবচয়ি গাঁথি পুষ্পমালা,
মানব যশস্বী কত ভব রঙ্গভূমে!
হায় রে সে পঞ্চবটী, সীতা পতিব্রতা,
হেন রাম গুণনিধি,—অপূর্ব্ব রচনা!—
এ হেন করুণাচ্ছবি কে পারে চিত্রিতে?
কোথা সেই ইন্দ্রপ্রস্থ, হিমাদ্রিতনয়া
কালিন্দীর কণ্ঠভূষা– ইন্দ্রালয়াধিক?
গাহিত জীমূতমন্দ্রে কবীন্দ্র যেখানে,
বীরেন্দ্রের কীর্ত্তিরাশি অতুল জগতে!
কোথা ভীষ্ম, কোথা দ্রোণ, কোথা যুধিষ্ঠির,
কোথা সে দ্রৌপদী সতী, বিক্রমকেশরী

অভিমন্যু ? কোথা সেই ভবমনোলোভা
সুন্দর বিরাট সভা ? যার চারুশোভা
কে পারে বর্ণিতে—কেহ পারে কি চিন্তিতে —
কল্পনা নহেরে যার সদা আজ্ঞাকারী ?

নাই সেই উজ্জয়িনী, বিলুপ্ত আঁধারে
নবরত্ন, ভারতের কুণ্ডল ভূষণ,
ভবের গৌরব ; প্রাণ কাঁদেরে স্মরিতে !
নাই সে বসন্ত, নাই সেই পিকরাজ
স্বভাবের ফুলবনে মনোরঙ্গে ভ্রমি
কে সিঞ্চিবে নবরস, অমৃত সিঞ্চনে ?
কে তুলিবে অতুলনা মধুর কাকলি
গভীর পাতাল পুরে, সুদূর জলদে ?
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় কেরে কাঁদারে জগৎ ।

কি লিখিতে কি লিখিলি রে পোড়া লেখনি
এ তোর দুঃখের গীত কেন যে গাইলি
অকালে ? কাঁদিছে বঙ্গ ঘোর হাহাকারে
মধুসূদনের শোকে, কাঁদেরে যেমনি
মধুবন মধু বিনে ! কেনরে কাঁদিলি ?
পুনঃ এ শোকের ঝড় কেনরে উঠালি ?
চল দোঁহে শুনি গিয়ে বঙ্গনাথ মুখে
কেমনে কাঁদিলা দুঃখে সাগর বাসবে
ত্রিদশের রাজলক্ষ্মী ত্রিদশ ছাড়িয়া।
গাইব নূতন গীত নবরসে ভাসি,
এ পোড়া পুরাণ কথা কেনরে লিখিলি ?— হ না

———

সূতিকাগৃহ।

সূতিকা-গৃহ ; এই স্থান এ মহা-সংসারের দ্বার-শিলা। যে দুর্বিনীত অহঙ্কার সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, যে দুর্বিনীত অহঙ্কার স্বীয় বীর্য্যবলে, আমি দেব-বীর্য্য-সম্ভূত বলিতে সাহসী হইয়াছিল ; যে দুর্বিনীত-অহঙ্কার শত সহস্র নরনারীর অশ্রুজল তুচ্ছ করিয়া, শত সহস্র মানবের ধমনীর রক্তে পদতল রঞ্জিত করিয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহা এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। যে দুর্জ্জয়বীর্য্য এক হুঙ্কারে ভূমণ্ডল কাঁপাইয়া দিয়াছিল, যে দুর্জ্জয়বীর্য্য, নরহত্যা শত সহস্র মনুষ্যের ব্যবসায় করাইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যের শোণিতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়াছিল, যে দুর্জ্জয় বীর্য্য বাত্যা, তুষার, প্লাবন সমস্ত তুচ্ছ করিয়া শত সহস্র রাজ্য স্বীয় বুভুক্ষানলে ভস্মীভূত করিয়াছিল, তাহা এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। যে অমানুষিক কল্পনা ভার্জ্জিল্‌কে সঙ্গে করিয়া নরকে যাইয়া হেলেনের, ক্লিওপেট্রার, ট্রিস্টনের, প্যারিসের, একিলিসের প্রেতাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিল, যে অমানুষিক কল্পনা বিট্রিস্‌কে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, যে অমানুষিক কল্পনা নরক, স্বর্গ সমুদায় পরিভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছে, তাহা এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। যে শাক্যঋষি এই বিপুল সংসারের তৃতীয়াংশ মানবের পূজা গ্রহণ

করিতেছেন, যে চৈতন্যদেব প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভারতকে প্রেমে পাগল করিয়া দিয়াছেন, যে শঙ্করাচার্য্য "আমিই ঈশ্বর" বলিতে সাহসী হইয়াছেন, তাঁহারা এই দ্বার দেশ দিয়া এ মহা-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে অচিন্ত নীয় চিন্তাশক্তি এই বিপুলা ধরিত্রীর আকর্ষণী শক্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছে, যে সুতীক্ষ্ণ-প্রতিভা পৃথিবীর স্থিরত্ব অপ্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছে, যে দৃষ্টি ফিসোলি পর্ব্বত-শিখর হইতে নিশাযোগে চন্দ্রমণ্ডলের দুর্নিরীক্ষ্য আভ্যন্তরিক প্রদেশ সমস্ত দেখিয়াছিল, তাহা এই দ্বার দেশ দিয়া এ মহা-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। দুর্বিনীত অহঙ্কার, দুর্জ্জয় বীর্য্য, অমানুষিক কল্পনা, দুর্নিরীক্ষ্য, অগাধ-সত্ত্ব, 'উৎকট-আত্মাভিমান,' অচিন্তনীয় চিন্তাশক্তি, অননুভবনীয় উদারতা, দুর্জ্জয় প্রেম সমুদায় এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা সংসারে প্রবেশ করিয়াছে।

এই গৃহে বসিয়া স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টির কৌশল নির্ম্মাণ করেন, এই গৃহে বসিয়া বিধাতা পুরুষ মানবের ঘূর্ণায়মান সুখ দুঃখের অদৃষ্ট-চক্র ঘুরাইয়া দেন। এই গৃহ হইতেই কেহ সুখের বোঝা ও কেহ দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া সংসারে পদক্ষেপ করে। এই গৃহে একদিন মহাকবি বাল্মীকি ছিলেন, এই গৃহে দেবর্ষি গৌতম ছিলেন, এই গৃহে বীর দ্রোণাচার্য্য ছিলেন, এই গৃহে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন, এই গৃহে সিসিরো, ডিমস্থেনিস্, এই গৃহে সোলন, সক্রেটিস; এই গৃহে কপিল, কনাদ প্রভৃতি মহাত্মারা ছিলেন। এই গৃহে কে ছিল না? তুমিও ছিলে আমিও ছিলাম। হরিবোল হরি! যেখানে পৃথিবীর অত

হার, সংসারের গৌরব, ইহলোকের দেবতারা ছিলেন, সেখানে আমিও ছিলাম। যাঁহাদিগের নিকটে আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, দুর্ব্বলের দুর্ব্বল, নীচের নীচ, তাঁহারা সেখানে ছিলেন আমিও সেখানে ছিলাম! এ অধমাধমও সেখানে ছিল! ঐ ত স্রষ্টার চাতুরী, তিনি ধনী দরিদ্র; মহৎ ক্ষুদ্র; পণ্ডিত মূর্খ, সুন্দর, কুৎসিত; এক স্থান হইতেই ছাড়িয়া দেন; তাঁহার দোষ কি? তিনি সকলকেই সমান করিয়া গড়িয়াছেন।—ভালবাসা।

মানব-দুঃখ।

যে চন্দ্র শীতল-কান্তি এখানে উদয়
পৃথিবীর প্রান্তে যাও তেমনি দেখিবে;
যে উল্কা চকিয়া হেথা গগনেতে ধায়
যাও—দেখ, দূর-দেশে—তেমনি ধাইবে!

তেমনি মানব মনে সুখ যদি থাকে,
স্বদেশ বিদেশ তার সকলি সুখের,
নতুবা বিধির চক্র কাল-চক্র পাকে
ঘুরে ফিরে রবে স্থির সম্মুখে দুঃখের।

মানবে দুঃখেতে যেন চুম্বকে লোহার,
সুখ স্বপ্নে নিমগন, ছিদ্র করি অন্বেষণ
কোথা হতে নিদারুণ দুঃখ গিয়ে তার
বিঘোর ঘুমের ঘোর সহসা ভাঙ্গায়।

তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে মিশে অনুক্ষণ,
তেমতি দুঃখের ঢেউ, রোধিতে পারে না কেউ
কম্পাসের লক্ষ্য দিক্ উত্তর যেমন,
নিয়ত দুঃখের লক্ষ্য মনুজ তেমন।

যে বায়ু বেগেতে ভাঙ্গে গৃহ, তরু, বন,
কেমনে সে কোন্ ছলে কাঁপাইবে হিমাচলে,
সার-সত্য যে অন্তর জানে না কখন
দুর্দ্দিন ঝঙ্কারে কভু দুর্ব্বল সে মন।—মনুজ।

শ্মশান।

এই খানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিত; মহৎ, ক্ষুদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালি; এই খানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক, সকল বৈষম্য এই খানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রূসো বল, রামমোহন রায় বল, কিন্তু এমন সাম্য-সংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং আমাদের সাধারণ নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এস্থান মহাভাবপূর্ণ—এস্থান সদুপদেশপূর্ণ—এস্থান পবিত্র।

এই স্থানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে; মনুষ্য-মহত্ত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম

করিতে সক্ষম হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশান-মৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অনভিভবনীয় বীর্য্য, যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার, আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে—তুমি আমি কে? যে উৎকট অভিমান, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল, তাহা এই মাটীতে বিলীন হইয়াছে—তুমি আমি কে? সেই দিন যে চিন্তাশক্তি, ঈশ্বরকে স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, তাহা এই মাটীতে মিশিয়াছে—তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য জীবন? এই নদীহৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায় যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া, একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে, যে আমাকে শৃগাল কুকুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে আমি কে—আমি কত টুকু—আমি কি? এই মাটীর পুতুলে অহঙ্কার শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার,—বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন, তাহা অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীরুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সেন, জীবনের ভয়ে, যবন হস্তে জন্মভূমি নিক্ষেপ করিয়া, মুখের গ্রাস ভোজনপাত্রে ফেলিয়া, তীর্থযাত্রা করিলেন, তিনিও এড়াইতে পারিলেন না।

শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই, হয়ত কখন দেখিবও না। কিন্তু শ্মশান ভূমির এই উপদেশ, জীবন্ত। এস্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এস্থান পবিত্র।

এখানে আসিয়া সকল জিনিসের সমাধি হয়। ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এই খানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালাযন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, সকল দুঃখ দূর হয়। আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এই খানে যে আগুন জ্বলে তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, কোমলতা পোড়ে, পবিত্রতা পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয় তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া, সব লুপ্ত হয়। তাই বলি এস্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে—যে চলিয়া যায়, তার সুখ; যে পড়িয়া থাকে, তার দুঃখ। এ সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে; মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে, সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজননপ্রবণতাও আছে। জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল মন্দ মিশ্রিত। সুতরাং প্রকৃতি দেখিয়া যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয়, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদি কারণ, সেও ভালতে মন্দে মিশ্রিত; অথবা দুইটী শক্তি হইতে এ

জগৎ সমুৎপন্ন—সেই শক্তির একটী ভাল, একটী মন্দ, একটী স্নেহ, একটী ঘৃণা ; একটী অনুরাগ, একটী বিরাগ ; একটী আকর্ষণ, অপরটী প্রতিক্ষেপ।

এই যে সংসার, ইহা এক মহাশ্মশান। চিরপ্রবহমান কালস্রোতঃ দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছ, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না। এই ক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না—অখিলসংসারে খুঁজিয়া দেখিও, কোথাও পাইবে না।' কোথায় যাইবে, কোথায় যায় তাহা তুমিও যতদূর জান আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছু থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে। সেক্ষপীয়র গিয়াছেন, হাম্লেট আছে। ওয়াসিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতা-ধ্বজা আজও উড়িতেছে। রুসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভি নাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে। অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়, কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে।

এই সংসার এক মহাশ্মশান। যে চিতানল ইহাতে গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিষ নাই ; জড় প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না ; যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই পোড়াইয়া সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে

চলিয়া যায়। ঐ যে নক্ষত্র নিচয় অল্প অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঐ সকল এই বিশ্বব্যাপী মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এ সংসারে, কোথায় অনল নাই? নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে, কুসুমের সৌরভে, মৃদুল পবনে, পাখীর কূজনে,—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না। ভালবাস, পুড়িতে হইবে, ভাল বাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে। পুত্র কন্যা না হইলে শূন্য গৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে, হইলে সংসার জ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া সুস্থ মনে অক্ষত শরীরে কে গিয়াছে? আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ সংসারে সহৃদয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই। অনন্ত জীব সমূহ, এই মহাবহ্নিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে,—জড় প্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র। শশধরের সদা হাসি হাসি মুখে কখন কি বিষাদ চিহ্ন দেখিয়াছ? কল্লোলিনীর কলনিনাদে কখন কি স্বর-বিকৃতি দেখিয়াছ? নবকুসুমিতা ব্রততীর দোলনীতে কখন কি তালভঙ্গ দেখিয়াছ? আমরা পুড়িতেছি—কিন্তু ঐ দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন, সমীরণ হাসিতেছে—হো—হো—হো।—উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম।



ভারতসঙ্গীত।

ভারতে বাগ্মী আজ নীরব গম্ভীর।
হায় কি অদৃষ্ট দোষে সকলি অস্থির!

আর সে গম্ভীর স্বরে করি মুগ্ধ তিন পুরে
গায় না ভারতবাসী ভারত-সঙ্গীত।
বীণাযন্ত্রে পূরে তান সুখেতে ভাসায়ে প্রাণ—
আর সে নারদ ঋষি গায় না ললিত।
অঘোর নিদ্রায় আজ সকলি নিদ্রিত!

এই কি পূর্ব্বের সেই ভারত ভবন?
এই কি সে আর্য্যজাতি—আর্য্যের নন্দন?
হায় সে পূর্ব্বের ভাব হলে হৃদে আবির্ভাব
বিষাদ সাগরে মন হয় রে মগন।
পরিতাপ তমোরাশি আবরে অম্বর আসি—
নিবিড় জলদ কোলে লুকায় তপন।
সেই আর্য্যপুত্র হাসি সঙ্গীত তরঙ্গে ভাসি
কবিত গম্ভীর স্বরে মোহিত ভুবন,—
এই কি আমরা সেই আর্য্যের নন্দন?

এই কি সে হিমাচল অচল ভূষণ?
যাহার শিখর দেশে অপ্সরী কিন্নরী এসে
মধুর মধুর গীতে মোহিত ভুবন—
এই কি সে হিমগিরি ভীষণ দর্শন?
হায়রে সকলি আছে ভাগ্যদোষে পড়ে পাছে
কিন্তু সে সঙ্গীত রব নীরব এখন।—
আর রে বাজে না বীণা মৃদঙ্গ তেমন!
সেই বিন্ধ্যগিরি বেগে ভেদিয়া নবীন মেঘে
ঊর্দ্ধমুখে চুম্বিতেছে অনন্ত গগন;
আজিও তুষার মাখি বাসনে শরীর ঢাকি

আছে সে হিমাদ্রি উচ্চে ফিরায়ে নয়ন ;
পাষাণে পাষাণে রঙ্গে আছাড়ি আছাড়ি অঙ্গে
আজিও ধাইছে গঙ্গা কলকল রবে।—
কিন্তু সেই পরীদলে নাহি আর কুতূহলে
মধুর সঙ্গীতে করে বিমোহিত ভবে।
নিদ্রিত জাগিয়া আজ সকলে নীরবে।

আছে সেই আর্য্যপুত্র অযোধ্যাভুবন,
আছে সেই হিমালয় দণ্ডক-কানন।
কিন্তু সে গম্ভীর স্বরে কাঁপাইয়া চরাচরে
দামামা দুন্দুভি ভেরী বাজে না ভীষণ।
কোদণ্ড টঙ্কার ঘন হয় হস্তী গরজন
করে না বিদার আর অবনী গগন।
নীরব সমর-শঙ্খ নিদ্রায় মগন।
সাহস উৎসাহ জলে ভাসি আর্য্যপুত্র দলে
আহবে অসুরে আর করে না দলন।
কিরীট কৃপাণ বাণ বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ
কার্ম্মুক নারাচ আদি সমর-ভূষণ
না জানি পড়িয়া আছে কোথায় এখন!

নীরব গম্ভীর ভেরী ঘুমে অচেতন!
নীরব বীণার রব নীরব বাজনা সব
নীরব অভাগা এই ভারত-নন্দন!
ভীমনাদে ঘোর গর্ব্বে কাঁপাইয়া জীব সর্ব্বে
প্রলয় অনল রাশি করি উদগীরণ
ভীষণ আগ্নেয় গিরি নীরব [illegible]

সেই নৃত্য সেই গীত　　সে বাজনা সুললিত
তেমতি নীরব ভূমি ভারত-নন্দন।—মুকুটোদ্ধার।

স্থানেশ্বরে হিন্দুমুসলমানের যুদ্ধ।

আজ সমরক্ষেত্রের ভয়ানক ভাব দেখিলে হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। একদিকে যবন-সৈন্যগণ দৃশদ্বতী পার হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আস্ফালন করিতেছে। কাহারো হস্তে বর্শা, কাহারো হস্তে কৃপাণ, কাহারো হস্তে বল্লম, কাহারো হস্তে ধনুক, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ, সকলেই যেন আজ ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়া 'আল্লা-হো' শব্দে দিক্‌দিগন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। অপরদিকে ধনুর্ধারী ও কৃপাণ ধারী রাজপুত সৈন্যগণ যবন-সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিপক্ষের হৃদয়ে ত্রাস উৎপাদন কবিতেছে। সম্মুখেই কামানশ্রেণী উদ্ঘাটিত বদনে যেন শত্রুবিনাশের প্রতীক্ষা করিতেছে। "জয় পৃথ্বীরাজের জয়" "জয় সমরসিংহের জয়" শব্দ হিন্দু সৈন্যগণের মধ্যে চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইতেছে। রাজপুত ও যবন সৈন্যের সমাবেশের কিঞ্চিৎ তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। ক্ষত্রিয় সৈন্যদের সম্মুখীন শ্রেণী প্রায় এক ক্রোশ পথ জুড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে স্বল্পতর সৈন্যের সমাবেশ। মধ্যশ্রেণীর সেনাপতি পৃথ্বীরাজ, তাঁহার দক্ষিণদিকে সমরসিংহ আপনার মিবার-সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের বাম-পার্শ্বের সৈন্যশ্রেণী যুবরাজ কল্যাণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের পশ্চাদ্ভাগে বিজয়সিংহ বহুসংখ্যক

সৈন্য লইয়া, সম্মুখীন শ্রেণীতে সৈন্যের অভাব হইলে তাহা পূরণ করিতে অথবা কোন স্থানে হঠাৎ কোন অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। এদিকে মহম্মদ ঘোরি সম্মুখীন সৈন্যশ্রেণী স্বল্পতর করিয়া পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যশ্রেণী প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া সমাবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল, সৈন্যে সৈন্যে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হইল। ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ বিকট গর্জ্জন করিয়া "জয় পৃথ্বীরাজের জয়—জয় পৃথ্বীরাজের জয়" করত বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। পৃথ্বীরাজের সৈন্যশ্রেণীই প্রথমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যবনসেনার সম্মুখীন শ্রেণীসমূহকে একবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। বিকট গর্জ্জনে কামান গর্জ্জিতে লাগিল, গোলার আঘাতে সম্মুখীন বিশালাকার যবনেরা খড়্গ ও ধনুকহস্তে ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেহ আল্লাহোর অর্দ্ধেক উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল, কেহবা পলায়ন-পর হইল। ক্রমে পৃথ্বীরাজের সৈন্যগণ আরো অগ্রসর হইতে লাগিল, জয়ধ্বনি করিতে করিতে জলপ্রপাত বেগে যবনদিগকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। মহম্মদ্‌ ঘোরি বন্যার জলের ন্যায় সম্মুখীন সৈন্যশ্রেণী পশ্চাদ্ভাগ হইতে ক্রমাগত বাড়াইতে লাগিলেন। কামানের গোলা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে সসৈন্যে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিয়া পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিলেন, সৈন্যদের উত্তেজনাবাক্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, উৎসাহে স্বয়ং সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া স্বহস্তে কৃপাণ চালনা করিতে লাগিলেন। পার্শ্ব

দেশ হইতে একবার পৃথ্বীরাজের ব্যূহভঙ্গ করিবার উপক্রম করিলেন, কতকটা ভঙ্গও করিলেন, কিন্তু কল্যাণমলবারের আগুয়ান যবন সৈন্যদল পলকের মধ্যে ছিন্নমস্তক হইয়া অশ্বারোহীদিগের অশ্বপদে দলিত হইয়া গেল। মহম্মদ ঘোরি এইবার দ্বিগুণতর ভীষণ পরাক্রমের সহিত তাঁহার সমস্ত সৈন্যের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য একবারে চালিত করিয়া পৃথ্বীরাজের ব্যূহের ভগ্নাংশে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তুমুল সংগ্রাম বাধিল, সমরসিংহের ও কল্যাণের সৈন্য আসিয়া প্রবিষ্ট যবনদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল, অশ্বপদ ও রথচক্রের ঘর্ষণে সমুত্থিত ধূলিরাশি এবং কামানের ধূম-সমূহ নভোমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল, যেন প্রলয়কালের জলদরাশিতে দিগন্ত আবরিত হইয়া গেল, সূর্য্য ঢাকিয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল, কামানের শব্দ, সৈন্যদের কোলাহল, রণবাদ্যের নিনাদ একত্রিত হইয়া প্রলয়ের বজ্রের ন্যায় গর্জ্জিত হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত হইতে লাগিল, ঘন ঘন তলবার চালনায় প্রলয়ের বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল। বীরপদদাপে পৃথিবী কম্পমান, যেন প্রলয়বিপ্লবে ধরণীমণ্ডল কেন্দ্রভ্রষ্ট হইবার উপক্রম করিতেছে। পৃথ্বীরাজ সম্মুখে, কল্যাণ বামপার্শ্ব হইতে এবং সমরসিংহ দক্ষিণদিক হইতে যবন সৈন্যদলকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। সেই সময় যদি বিজয়সিংহ আসিয়া চতুর্থদিকটা ঘিরিয়া ফেলিতে পারিতেন, তাহা হইলে ব্যূহগত একটী যবনকেও আর ফিরিয়া যাইতে হইত না, একটী যবনের পক্ষেও আর সে রাত্রি প্রভাত হইত না, কিন্তু বিজয়সিংহ অকর্মণ্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া সজ্জিত

আপন সৈন্য সমস্ত লইয়া পৃথ্বীরাজের পশ্চাদ্ভাগে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন, তাঁহার সৈন্যদের উৎসাহ বরং অবরোধ করিতে চেষ্টা পাইলেন এবং 'এখনো সময় হয় নাই' বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। এদিকে মহম্মদ ঘোরি তিনদিক হইতে ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইয়া যবনসেনার অধিকাংশকেই ধরাশায়ী দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সমেত চতুর্থ দিক দিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন। আপনিই সকলের অগ্রে, অশ্বচালনা করিয়া দিলেন, সেনাগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে অনুগমন করিল, পৃথ্বীরাজ সমরসিংহ ও কল্যাণ তিনজনেই তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন এবং ক্ষত্রিয় তলবারের খরসানে আর্য্যস্থল, যবনরক্তে প্লাবিত করিয়া তুলিলেন। যবনেরা দৃশদ্বতীর পরপারে যাইলে পর ক্ষত্রিয়ের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিল। হিন্দুরা রণজয়ী হইল সকলে মিলিয়া মহাদেবের পূজায় ও আশাপূর্ণা দেবীর জয়কীর্ত্তনে অধিক রাত্রি যাপন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল।—দীপ-নির্ব্বাণ।

চকোর-বিলাপ।

কতকাল আর শশী মেঘাবৃত থাকিবে?
চঞ্চল চকোর-প্রাণ আর, কত সহিবে?
দিনান্তে না দেখি চাঁদে কত যে পরাণ কাঁদে
এ প্রমাদে, ওরে বিধি, কেন মোরে ফেলিলে?
কেন ধরা আঁধারিয়ে এ কাল জলদ দিয়ে,
আজি এ পূর্ণিমা শশী আঁখি আড়ে রাখিলে?

জগতে একই চাঁদ এ প্রাণে একই সাধ,
সে সাধে সাধিয়ে বাদ কি বিষাদে ডুবালে ?
যার প্রেম অনুরাগে পরাণ রোপিলে আগে,
তবে তারে লুকাইয়ে কত আশা ঘুচালে !
গগনে শুধুই ঘন ঘন ঘন গরজন
কি জানি কথন শিরে অশনি রে পড়িবে,
সে ভয়ে আকুল প্রাণ কেমনে পাইব ত্রাণ
কেবা আর সুধাদানে পোড়া প্রাণে রাখিবে !

একাল জলদদল দূর কিবে হবে না ?
দূরে গেলে মেঘ কিবে নিশি আর রবে না ?
আসিবে প্রখর রবি গ্রাসিবে কি শশি-ছবি,
এ তাপিত তনু তবে কেবা আর জুড়াবে ?
কেবা আর হাসি হাসি বিমল বিমানে আসি
সরসী সলিলে ভাসি সুধারাশি ছড়াবে ?

শুকায়েছে সরোবর বলে কি রে লুকালে ?
তাই কি আমারে এত আঁখিনীরে ভাসালে ?
যবে বারি-পূর্ণ ছিল, দূর হতে সে সলিল,
কৌমুদী মাথায়ে মরি কিবা শোভা করিতে !
তরুলতা, সরোবর, এবে সব শুষ্কান্তর,
তুমিও লুকালে বিধু অভাগারে বধিতে !

শুকাবার নহে সিন্ধু তা না হলে শুকাত,
সে সলিল তা না হলে এ নিদাঘে ফুরাত ;

সিন্ধু সদা পূর্ণ রবে বিন্দু নাহি শুষ্ক হবে
না হেরেও ইন্দুমুখ উথলিয়া উঠিবে।
কেবল সরসী-জল শুকায়েছে সর্ব্বস্থল,—
কেবলি আমার প্রাণ দিবানিশি কাঁদিবে!-কুসুমমালা।

মৃত্যু।

দূষিত বায়ু সেবন করিলে এবং আহার বিহারাদি আত্যহিক ক্রিয়ার যথানিয়মের কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য ঘটিলেই রোগগ্রস্ত হইতে হয়। সেই রোগ উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা শান্ত না হইলে, সুতরাং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কারণ হইয়া উঠে। আর সেই যে ভয়ঙ্কর মৃত্যু—যাহার নাম শুনিলে জীবমাত্রেরই হৃৎকম্প হইতে থাকে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিলে জাজ্বল্যমানবৎ প্রতীত হইবে, যে সেই মৃত্যুকে জগদ্বিধাতা সৃজন করিয়া জগতের প্রতি অমৃতবর্ষণ করিয়াছেন। কারণ, অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত, ও জলে পতিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে যে প্রকার অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়, সেইরূপ যাতনা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকিলে, কি কষ্টের বিষয় হইত তাহা বচনাতীত। অতএব করুণাময় পরমেশ্বর মৃত্যু সৃষ্টি করিয়া এই সকল দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করিবার উপায় করিয়াছেন।—বিজয় বসন্ত।

সেই ত সকল।

হায় সেই ত সকল, পূর্ব্ব গৌরবের স্থল,
এই ত ভারত ভূমি প্রিয় নিকেতন,
এই সেই পুণ্যস্থান শোভার সদন।
কেন রে আঁধারময়, কেন অচেতন প্রায়,
নাহি কেন রবিকর ভারত-আগারে,
নির্জীব ভারত কাঁদে দর দর ধারে।
সেই বাট সেই মাঠ, সেই সরোবর ঘাট,
সেই সমুদয় আজ করি দরশন,
তবে কেন দেখি সব বিষাদে মগন!
সেই রবি, সেই শশী, সেই দিবা, সেই নিশি,
সকলি নিয়ম মত চলেছে তেমন,
কেন আর্য্যসুত সব মোহে অচেতন।
হিমালয় বিন্ধ্যাগিরি, মস্তক উন্নত করি,
গগন পরশি গর্ব্বে আছে দাঁড়াইয়া,
ভারত-গৌরব কেন গেল রে নিবিয়া?
আসিছে বসন্তকাল, বিস্তারি রূপের জাল,
সকলিত রহিয়াছে পূর্ব্বের মতন,
শরতের শশী আসি হাসায় ভুবন।
তবে কেন নিদ্রাগত, ভারতবাসীরা হত,
জাগে না কি পূর্ব্বকথা কাহার অন্তরে,
না ছিঁড়িবে মোহপাশ জাগিয়া অচিরে?
জ্ঞান, মান, বীর্য্য, বল, কোথায় সকল বল,
পিতা পিতামহ কীর্ত্তি ভুলিলে কেমনে,
কলঙ্ক কালিমা কেন ঢালিলে জীবনে?—বঙ্গবন্ধু

পরিশিষ্ট।

কাব্য।

যে রচনাপাঠে পাঠকের হৃদয়ে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও চমৎকার রসের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম কাব্য। সুতরাং রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলে। রসহীন রচনাকে কাব্য বলা যাইতে পারে না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যের এইমত প্রকারভেদ করিয়াছেন। কাব্য প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত। দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য শুনা যায় অথচ রঙ্গভূমিতে যাহার অভিনয়ও দেখা যায়, তাহার নাম দৃশ্যকাব্য। দৃশ্য কাব্যকেই নাটক বলে। যথা; কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব, বিধবাবিবাহ, নবীন তপস্বিনী ইত্যাদি। যাহার কেবল শ্রবণ বা পাঠ হয় তাহার নাম শ্রব্যকাব্য। যথা; রামায়ণ, বেতালপঞ্চবিংশতি ইত্যাদি। শ্রব্যকাব্য তিন প্রকার; গদ্যময়, পদ্যময়, ও গদ্যপদ্যময়। উঁহাদিগেরও আবার প্রকারভেদে পৃথক পৃথক নাম আছে। ১—কোন দেবতা বা বিখ্যাত রাজা কিম্বা ব্যক্তির বৃত্তান্ত লইয়া অথবা কোন ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে অতি বিস্তৃত চমৎকারজনক বর্ণনাপূর্ণ কাব্য বিরচিত হয় তাহার নাম মহাকাব্য। যথা; রামায়ণ, মহাভারত, মেঘনাদবধ ইত্যাদি। ২—মহাকাব্য অপেক্ষা

অল্পায়ত ক্ষুদ্রকাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে। যথা; ঋতুবিলাস, মেঘদূত ইত্যাদি। ৩—এক প্রসঙ্গের কতকগুলি পরস্পর অসম্বন্ধ শ্লোককে কোষকাব্য বলে। যথা, রসতরঙ্গিণী, সদ্ভাবশতক ইত্যাদি। ৪—গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। যথা, সুধীরঞ্জন, বসন্তসেনা ইত্যাদি। ৫—তানলয়যুক্ত স্বরে গ্রথিত কাব্যের নাম গীতিকাব্য। যথা; পদাবলী প্রভৃতি। ৬—পশ্বাদির ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া বিরচিত গ্রন্থের নাম উপাখ্যান। যথা; পশ্বাবলী, প্রাণিবৃত্তান্ত।

বঙ্গভাষায় কাব্যের উক্তরূপ প্রকারভেদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তিনটিমাত্র শ্রেণী ধরিলেই তন্মধ্যে সকল প্রকার কাব্যের স্থান হইতে পারে। ১ম—দৃশ্য-কাব্য অর্থাৎ নাটকাদি। ২য়—মহাকাব্য অথবা আখ্যান-কাব্য। রামায়ণ, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। অধুনা দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, প্রতাপসিংহ, মৃন্ময়ী বঙ্গাধিপ-পরাজয়, বঙ্গ-বিজেতা প্রভৃতি যে সকল উপন্যাসের প্রচার আরম্ভ হইয়া বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহারাও এই শ্রেণী নিবিষ্ট। ৩য়—খণ্ডকাব্য। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে, এমন কাব্যমাত্রই তৃতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত। সংপ্রতি বঙ্গভাষায় যে গীতিকাব্যের সম্যক সমাদর দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। বৈষ্ণবদিগের প্রাচীন পদাবলী, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী প্রভৃতি বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

রস।

কোন বর্ণনা শ্রবণে, পাঠে অথবা নাটকাদির অভিনয় দর্শনে হৃদয়ে যে স্থিরতর অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, সেই স্থায়ী ভাবের নাম রস। রস নয় প্রকার—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত।

১। নায়ক নায়িকার অনুরাগ বিষয়ক ভাবকে আদি-রস বলে।

২। দয়া, ধর্ম্ম, দান ও সংগ্রামাদিতে উৎসাহবিষয়ক ভাবের নাম বীররস। যথা;—

" দেখাব ভারতবীর্য্য দেখাব কেমন,
বলে যদি হিমাচল, কবে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটী চরণ।
যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়ে বলে,
ডুবায় সিন্ধুর জলে, তথাপি ক্ষত্রিয় দলে
টলাইতে না পারিবে বলে কি কৌশলে;
সহেনা বিলম্ব আর চল ভ্রাতাগণ,
চল সবে রণ স্থলে, দেখিব কে জিনে বলে,
ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পণ।"

৩। ইষ্টনাশে বা অপ্রিয়-সমাগমে যে শোক সঞ্চার হয়, তাহার নাম করুণরস। যথা,—

"হা বিধাতঃ! কেন তুমি আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভার গ্রহণে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে? হা কঠিন হৃদয়! তুমি এখনও প্রস্থান করিতেছ না কেন? হা দগ্ধ কলেবর! তুমি এখনও সর্ব্বাবয়বে বিশীর্ণ হইতেছ না কেন? ইত্যাদি।

৪। চমৎকারজনক বিষয় দর্শনাদি জন্য মনে যে বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয় তাহার নাম অদ্ভুতরস। যথা ;—

"একিলো একিলো, একি কি দেখিলো
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব
কেমনে এল এখানে॥"

৫। বিকৃত আকার, বাক্য ও চেষ্টা দ্বারা যে রসের সঞ্চার হয়, তাহার নাম হাস্যরস। যথা;—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি দুচার আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।' ইত্যাদি।

দুর্গেশনন্দিনীর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ-প্রকরণ, এবং অনেকানেক নাটকের বিদূষক ব্যাপার হাস্যরসের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

৬। যাহা হইতে মনে ভয় জন্মে তাহাকে ভয়ানক রস বলে। যথা ;—

"অন্ধকার মধ্যে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলাম এক বিকটমুখভঙ্গী দীর্ঘাকার পুরুষ লোহিত লোচনে আমাকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখভঙ্গী দেখিয়া আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল! ক্রমে ক্রমে আমার সংজ্ঞা বিলোপ প্রাপ্ত হইল।" ইত্যাদি।

৭। ঘৃণাজনক রসকে বীভৎস রস বলে। যথা ;—

"অজীর্ণ ভোজনদ্রব্য উগারি দুর্ম্মতি,
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে।"

৮। ক্রোধজনক রসের নাম রৌদ্ররস। যথা ;—

"বাখানি

বীরপণ্ম তোর আমি সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি
তুই, কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।"

৯। তত্ত্বজ্ঞানাদি জন্য মনে যে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় তাহাকে শান্তরস কহে। রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-সঙ্গীত শান্তরসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কেহ কেহ বৎসল রস বলিয়া আর একটী রসের অব-তারণা করিয়াছেন। পুত্রাদির প্রতি পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের যে স্নেহ জন্মে, তাহা বৎসল রস। আলঙ্কারি-কেরা ইহাকে স্বতন্ত্র রস বলিয়া গণনা করেন না।

কাব্যের মধ্যে এক এক রস প্রধান থাকে, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রসও বর্ণিত হয়। যে কাব্যে যে রস প্রধান তাহাকে সেই রসাত্মক কাব্য বলে। যথা, কাদম্বরী কাব্যে আদি, বীর, বিস্ময়াদি নানা গুণীভূত রস সত্ত্বেও কারুণ্য রসপ্রধান বলিয়া উহা করুণরসাত্মক কাব্য। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব হাস্যরসাত্মক কাব্য।

গুণ।

কাব্যের উৎকর্ষসাধক ধর্ম্মকে গুণ বলে। গুণ তিন প্রকার;—মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ। ঐ তিন গুণানুসারে রচনার রীতিও তিন প্রকার। যথা,—মধুরা, ওজস্বিনী ও প্রসন্না।

১। বাক্যের যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র চিত্ত আর্দ্র ও দ্রবীভূত হয়, তাহার নাম মাধুর্য্যগুণ। আদি, করুণ ও শান্ত রসেই সমধিক মাধুর্য্যগুণ থাকা আবশ্যক। মাধুর্য্যগুণে

সংস্কৃতমূলক সমাসশূন্য বা অল্প সমাসযুক্ত পদবিন্যাস করিতে হয়। এইরূপ রচনাই মধুরারীতিসম্পন্ন ও সুললিত হয়। যথা :—

"ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্রশাখা সমন্বিত সলিলপূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের পাদাম্বুজরজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।" ১

"হরিনামামৃত পানে বিমোহিত
সদা আনন্দিত নারদঋষি,
গাইতে গাইতে, অমরাবতীতে
আইল একদা উজলি দিশি।" ২

২। রচনার যে গুণদ্বারা চিত্ত উদ্দীপ্ত হয় তাহার নাম ওজোগুণ। বীর, বীভৎস, ভয়ানক প্রভৃতি রসে ওজোগুণের আধিক্য দেখা যায়। ইহাতে সংস্কৃত-মূলক শব্দ ও সমাসের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ রচনাই ওজস্বিনী রীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। যথা ;—

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে,
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।
লটাপট্ জটাজুট্ সংঘট্ট গঙ্গা,
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা।"

৩। যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র অর্থগ্রহ হয়, তাহার নাম প্রসাদগুণ। ইহা সমস্ত রস ও রচনায় উপযোগী। এই [illegible] রচনাকে প্রসাদরীতি বলে। যথা ;—

পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।" ইত্যাদি।

অলঙ্কার।

যেমন ভূষণদ্বারা শরীর সুশোভিত হয়, সেইরূপ অনুপ্রাস উপমাদি দ্বারা কাব্য সুশোভিত হইয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার বলে। অলঙ্কার দুই প্রকার, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। যদ্দ্বারা কেবল শব্দেরই সৌন্দর্য্য সাধিত হয় তাহার নাম শব্দালঙ্কার, আর যদ্দ্বারা অর্থের বৈচিত্র্য বা সৌন্দর্য্য সাধিত হয় তাহার নাম অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার।

বঙ্গভাষা প্রচলিত শব্দালঙ্কার মধ্যে অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ এই তিনটী প্রধান।

১ অনুপ্রাস। একরূপ ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাস অথবা শব্দের বর্ণগত সাম্যকে অনুপ্রাস কহে। যথা;—

"লুপ্ত-গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।" ১

"গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ,
কবিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস।" ২

২ যমক। ভিন্নার্থবোধক একাকার পদ একত্র বিন্যস্ত হইলে যমকালঙ্কার হয়। স্থানবিশেষে বিন্যাস জন্য যমকের চারিপ্রকার ভেদ হইয়াছে। আদ্য, মধ্য, অন্ত্য ও মিশ্র। ক্রমান্বয়ে যথা;—

আদ্য;—"ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে,
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহারি বর্ণনে।"

যথা,—"পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা
তরিবারে সিন্ধু ভব ভব সে ভরসা।"

অন্ত্য;—"আট প.ণ আধসের আনিয়াছি চিনি,
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।"

মিশ্র;—সমকে ক বি কয়ী করি হযুঁবে হয় না।

৩। শ্লেষ। যে স্থলে একটী শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়, তথায় শ্লেষালঙ্কার হয়। যথা,—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গানামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি,
জীবনস্বরূপা, সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।"

এস্থলে বৃদ্ধপতি, সিদ্ধি, গুণ, কু, দ্বন্দ্ব, তরঙ্গ, জীবন, পাষাণ বাপ ইত্যাদি শব্দ ও পদ শ্লিষ্ট, এজন্য এ সন্দর্ভে দুইটী পৃথক পৃথক অর্থের বোধ হইতেছে।

অর্থালঙ্কার।

অর্থালঙ্কার অনেক, তন্মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির লক্ষণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১ উপমা। যথা, যেন, সম, সদৃশ ও তুল্যাদি শব্দ-দ্বারা দুই বস্তুর সাদৃশ্য কথনকে উপমা কহে। যথা;

"কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পরপরশনে।" ১

"যেমন জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয় সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবে।" ২

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান, ও যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় কহে। যেখানে উপমান, উপমেয়, উপমানবাচক পদ এবং সমান এই সাধারণ ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সেখানে পূর্ণোপমা হয়। দুই একটী লুপ্ত থাকিলে লুপ্তোপমা কহে। যথা,—পদ্মলোচন অর্থাৎ পদ্মের ন্যায় মনোহর লোচন। এখানে উপমান ও উপমেয় মাত্র আছে কিন্তু উপমানবাচক ন্যায় শব্দ ও সাধারণ ধর্ম্ম মনোহর পদ লুপ্ত আছে। এক উপমেয়ের দুই বা ততোধিক উপমানের সহিত তুলনা হইলে মালোপমা হয়। যথা,

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে,
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে,
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পায় দিবাকর দেখে,
হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুত্রী পরিতুষ্ট অতিশয়।"

উপমান ও উপমেয় এক হইলে অনন্বয়োপমা কহে যথা; "তোমারই তুলনা তুমি—" ইত্যাদি।

২ উৎপ্রেক্ষা। যে স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সহিত অপর কোন বিষয়ের অভেদ কল্পনা করা যায়, সেইস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেন, বুঝি, বোধ হয় প্রভৃতির

প্রয়োগ থাকিলে বাচ্যা এবং না থাকিলে প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা কহে। ক্রমান্বয়ে যথা,—

বাচ্যা,—"অরুণে উদয়াচলে হেরি সুধাকর
ভয়েতে হইল বুঝি পাণ্ডু কলেবর।"

প্রতীয়মানা,—ছেলেটি কার্ত্তিক।

৩ রূপক। সাদৃশ্য হেতু বর্ণনীয় বিষয়ে অভিন্নরূপে বিষয়ান্তর আরোপ করিলে রূপক অলঙ্কার হয়। রূপক বোধের জন্য রূপ বা স্বরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"কিয়ৎক্ষণ পরেই দিবাকররূপ প্রহরী গগনরূপ রথ হইতে অপসৃত হইলে তিমিররূপ তস্করেরা তরুকোটর গৃহকোণ, কারাগার, কূপগর্ত্ত, গিরিগুহা প্রভৃতি নানা নিভৃতস্থান হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গমন করিল।"

সমাস বা অন্য কোন কারণে কখন কখন রূপ বা স্বরূপ শব্দ লুপ্ত থাকে। যথা,—

"উদর-আকাশে সুত-চন্দ্রের উদয়।"

৪ ব্যতিরেক। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। যথা,—

"চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল,
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল।"

৫ ভ্রান্তিমান। অত্যন্ত সমতাপ্রযুক্ত একবস্তুতে কবিকল্পনাকৃত অন্যবস্তুর ভ্রান্তিকে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার কহে। যথা,—

"বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম,
লক্ষ্মী সরস্বতী শক্তি আইলে হয় ভ্রম।"

কবিকল্পনা ভিন্ন যথার্থ ভ্রান্তিকে ভ্রান্তিমান বলে না।

৬ অর্থান্তরন্যাস। সাধারণ ঘটনার দ্বারা বিশেষ বিষ-

ষের অথবা বিশেষ ঘটনাদ্বারা সাধারণ বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করিলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন,
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।" ১

"অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুখিয়া যায়,
হেদে লক্ষ্মী হলো লক্ষ্মীছাড়া।" ২

৭ স্বভাবোক্তি। প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ বর্ণনের নাম স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। যথা ,—

"মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী,
ডানি করে ভাঙ্গা নড়ী, বাঁম কক্ষে ঝুড়ী,
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাদি,
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি।"

৮ অতিশয়োক্তি। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা ,—

"———হায় সূর্পনখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ?"

"বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার,
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার,
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে,
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।"

৯ নিশ্চয়। আরোপ্যমাণ বিষয়ের নিষেধ পূর্ব্বক প্রকৃত বিষয়ের সংস্থাপনের নাম নিশ্চয়ালঙ্কার। যথা ,—

"ভূত প্রেত যক্ষ নহে, নহে সখি দানা,
অনঙ্গ দিয়াছে কামিনীর অঙ্গে হানা।"

১৫ নিদর্শনা। তুল্যভাববশতঃ কোন বিষয়ে অবাস্তবিক বিষয় আরোপ করিয়া উভয়ের সাদৃশ্য কল্পনাকে নিদর্শনালঙ্কার কহে। যথা ;—

"কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার,
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার ?"

"রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?" ২

এস্থলে ভিখারী রাঘব কর্ত্তৃক দেবকুলত্রাস বীর্য্যশালী ধনুর্দ্ধরের প্রাণসংহার ও বিধাতার ফুলদল দিয়া শাল্মলী তরুবচ্ছেদন, উভয়ই তুল্যরূপে অসম্ভব এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

১১ ব্যাঘাত। যে উপায়ে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই উপায়েই যদি অন্য কেহ তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহা হইলে ব্যাঘাত অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর,
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর।
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর,
তাই বলি থাকে চল শ্বশুরের ঘর।"

১২.কাব্যলিঙ্গ। এক বাক্য অপর বাক্যের কি এক পদার্থ অপর পদার্থের হেতু হইলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া।" ১

"এই কি তোমার ভূষণ রত্নাকর?" ২

১৩। অপহ্নুতি। প্রকৃত বস্তুর প্রতিষেধ করিয়া অন্য বস্তুর আরোপের নাম অপহ্নুতি অলঙ্কার। যথা,—

"ও নহে আকাশ, নীল নীর নিধি হয়,
ও নহে তারকাবলী, নব ফেনচয়।" ১

"শশী নহে দেখ ঐ জলন্ত অনল;
কলঙ্ক ও নহে, ধূম বিস্তৃত কেবল।" ২

১৪। ব্যাজস্তুতি। যেখানে নিন্দা-চ্ছলে স্তব বা স্তব-চ্ছলে নিন্দা করা হয়, সেখানে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলে। যথা;—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়.
কোন গুণ নাই, যথা তথা ঠাই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।" ১

"পাইলে পৌরুষ বধি বিরহিনীকুল,
উজলিলে বিধু সিন্ধু নিজ জন্ম কুল।" ২

১৫। সমাসোক্তি। প্রকৃত বিষয়ে কার্য্য, লিঙ্গ বা বিশেষণের সমতা জন্য কোন অপ্রকৃত ব্যবহার আরোপিত হইলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা;—

"হায়রে! তোমারে কেন দোষি ভাগ্যবতি?
ভিখারিনী রাধা এবে, তুমি রাজরাণী,
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে! তব সঙ্গিনী,
অর্পেণ সাগর করে তিনি তব পাণি!
সাগর বাসরে তব তাঁর সহ গতি।"

এস্থলে যমুনার প্রতি কামিনীর ধর্ম্মের আরোপ হইয়াছে।

১৬ স্মরণ। সদৃশবস্তুর দর্শনে পূর্ব্বদৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়েব স্মরণ হয়, তাহাকে স্মরণালঙ্কার কহে। যথা,—

"পূর্ণবিম্ব সুধাকর করি নিরীক্ষণ,
স্মৃতি-পথে আসে সেই প্রিয়ার বদন।"

১৭ তুল্যযোগিতা। যে স্থানে নানা পদার্থের এক গুণ অথবা ক্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দেখা যায়, তথায় তুল্য-যোগিতা অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"তীর, তারা, উল্কাপাত শীঘ্রগামী যেবা।" ১

"চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।" ২

১৮ প্রতীপ। প্রকৃত উপমাকে উপমেয় কল্পনা কিংবা ঐ উপমানের বৈকল্য বর্ণনা হইলে প্রতীপ অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"দুর্জ্জন যথায় তথা কেন হলাহল,
জ্ঞাতি যথা, কেন তথা প্রদীপ্ত অনল।"

১৯ দৃষ্টান্ত। যেখানে উপমানবাচক যথা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার না করিয়া এবং একরূপ সাধারণ ধর্ম্ম না দেখাইয়া সমভাবাপন্ন দুই বিষয়ের সাদৃশ্য দেখান হয়, তথায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"গুণ দোষ কেবা আগে করে অবগতি,
শ্রুতি মাত্র মন হরে সুকবি ভারতী,
দৃষ্টিমাত্র কেবা লভে পরিমল ধন,
তথাপি মালতী মালা হরে বিলোচন ;

২০ বিভাবনা। হেতু ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হইলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। যথা ;

"ত্রাস নাই, তবু আত্মরক্ষা নিরন্তর,
রোগ নাই, তবু ধর্ম্ম সেবনে তৎপর।
অর্থের সঞ্চয় আছে, কিন্তু নাই লোভ;
ব্যসনী নহেন, তবু বিষয় সম্ভোগ।

২১ সন্দেহ। কবিকল্পনাকৃত সংশয়কে সন্দেহালঙ্কার বলে। যথা;—

"বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিংবা ভবের ভবানী
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।"

২২ বিষম। পরস্পর বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সংঘটন হইলে বিষমালঙ্কার হয়। যথা,—

"জুড়াইতে চন্দন লেপিলে অহর্নিশ,
বিধির বিপাকে তাহা হয়ে উঠে বিষ।"

২৩ দীপক। একমাত্র কারক অনেক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে অথবা প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত দুই বিষয়ের এক ক্রিয়া হইলে দীপক অলঙ্কার হয়। যথা;—

"ঘটিলে খলের সঙ্গ সকলে শঙ্কিত,
খলে আর বিষধরে ধরে এক রীত।"

২৪ অপ্রস্তুত প্রশংসা। বর্ণনীয় বিষয়টী গূঢ় রাখিয়া যদি অপ্রস্তুত কোন বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা উহার প্রতীতি করা যায়, তবে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়। যথা;—

"চাতকে যাচিলে জল হইয়ে কাতর,
মৌন ভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর?"

২৫ বিশেষোক্তি। কারণসত্ত্বে কার্য্যের অভাব হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা;—

"যদি করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই,
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোসাই।"

২৬ বিরোধাভাস। যে স্থলে শ্রবণমাত্র বিরো প্রতীতি কিন্তু পর্য্যবসানে বিরোধভঞ্জন হয়, সেখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন সুমতি কুমতি।"

ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব, এ জন্য পর্য্যবসানে বিরোধের ভঞ্জন হইয়েছে।

২৭ অনুকূল। প্রতিকূলাচরণ করিলে যদি তাহা অনুকূল ভাবে পরিণত হয়, তবে অনুকূলালঙ্কার কহে। যথা ,—

"তুষিতে তোমায় প্রভু নানা বেশ ধরি,
এ জগতে জগদীশ! যাতায়াত করি।
ইথে যদি নাহি হয় সন্তোষ সঞ্চার,
নিবার নিবার যাতায়াত বার বার।"

২৮ বিধ্যাভাস। যেখানে বিধিবাক্য নিষেধে পর্য্যবসিত হয়, সেখানে বিধ্যাভাস অলঙ্কার বলে। যথা ;—

"যাও যাও সুখী হও, করি এই আশ,
যেন তথা জন্ম হয়, যথা তব বাস।"

২৯ উল্লেখ। এক বিষয়ের বিবিধপ্রকারে উল্লেখের নাম উল্লেখ অলঙ্কার। যথা ;—

"গাম্ভীর্য্যে রত্নাকর, স্থৈর্য্যে হিম ধরাধব,
ক্রোধে প্রলয় কালাগ্নি, ক্ষমাতে সদৃশ ক্ষৌণী।"

৩০ সার। ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বর্ণিত হইলে সার অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবন সার
কর্ম্ম হেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার।
সপ্তদ্বীপ মধ্যে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ,
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ।
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান,
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগোয়ান।"

৩১ সম। শ্লাঘাযোগ্য বস্তুর পরস্পর সংঘটনকে সমালঙ্কার বলে। যথা ;—

"হরসনে উমা, হরিরে রমা, শশধর বর সনে ত্রিযামা।
এইরূপ যেবা যাহার সম, তার সনে ঘটে এই সে ক্রম।"

৩২ বিচিত্র। ইষ্টফল প্রত্যাশায় অনিষ্ট অনুষ্ঠানের নাম বিচিত্র অলঙ্কার। যথা ;—

"উন্নত হইবে বলি নত হও আগে,
দুঃখের শৃঙ্খল পর সুখ অনুরাগে।
জীবন রক্ষার হেতু দিতে চাও প্রাণ,
সম্মান রাখিতে আগে হও হতমান।"

৩৩ অসঙ্গতি। একত্র কারণ, অন্যত্র তাহার কার্য্য হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"গগনেতে জলধর করয়ে গর্জ্জন,
বৃষ্টি করে বিরহিণী নারীর নয়ন।

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ,
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।"

৩৪ অধিক। আধার বা আধেয়ের আধিক্য বুঝাইলে অধিকালঙ্কার হয়। যথা,—

"যাহার কুক্ষিতে বিশ্ব রহে তিলমানে,
সেই হরি সিন্ধুগর্ভে বিন্দুমাত্র স্থানে।"

৩৫ অন্যোন্য। পরস্পর এক [illegible]র কারণ হইলে অন্যোন্যালঙ্কার হয়। যথা;—

"নিশিতে শশীর শোভা শশীতে নিশির।"

৩৬ ভাবিক। যদি পরোক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষবৎ অথবা ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা বর্ত্তমানবৎ বর্ণিত হয় তবে ভাবিক অলঙ্কার হয়। যথা:—

"এখনো আমার যেন বাজিতেছে কাণে,
বিজনে গাইছে পিক সুমধুর তানে।"

৩৭ কারণমালা। পূর্ব্ববাক্য পরবাক্যের কারণ হইলে কারণমালা অলঙ্কার বলে। যথা:—

"বিদ্যা হতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি,
ভক্তি হতে মুক্তি হয়, এই সার যুক্তি।"

৩৮ সহোক্তি। সহশব্দের বলে একপদ উভয়ার্থের বাচক হইলে সহোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা;—

"বিকসিত কামিনীকুসুম তরুমূলে,
বসিলাম চিন্তা সখী সহ কুতূহলে।"

৩৯ বিনোক্তি। বিনা শব্দ সংযোগে কোন পদার্থের শোভা প্রতীয়মান হইলে বিনোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা ;—

"সরোজিনী বিনা সরঃ ভানু বিনা দিন,
নিশাপতি বিনা নিশা হয় প্রভাহীন।"

চিত্রালঙ্কার।

পদ্যের অন্তর্গত বর্ণ দ্বারা পদ্মাদির আকার চিত্রিত হইলে তাহাকে চিত্রালঙ্কার কহে। এরূপ স্থলে কবিদিগকে বর্ণের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয় বলিয়া উহাতে তাদৃশ রসভাব সমন্বিত কবিত্বের প্রস্ফুটন হয় না।

বর্ণের বিন্যাস কৌশল সম্পুটন পদ্মের আকার হইলে পদ্মবন্ধ, তড়াগের আকার হইলে তড়াগবন্ধ এবং কেয়ুরের আকার হইলে কেয়ুরবন্ধ কহে। বর্ণ বিন্যাস কৌশলে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে। এরূপ অলঙ্কার অত্যন্ত বিরল, নাই বলিলেই হয় এজন্য বিস্তার করিলাম না।

প্রহেলিকা।

প্রহেলিকা অর্থাৎ হিঁয়ালী বাক্য কৌশল মাত্র। তাহাতে রসবোধের সম্পূর্ণ বিরোধ জন্মায় বলিয়া উহাকে অলঙ্কার কহে না।

"বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়,
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়,
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে।
মুর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।"—পক্ষী।

দোষ।

যদ্দ্বারা কাব্যের অপকর্ষ হয়, তাহাকে দোষ বলে। প্রধান প্রধান দোষগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। বিনা কারণে কর্কশ শব্দের প্রয়োগে শ্রুতিকটুতা দোষ হয়। যথা,—সম্রাড়ান্তরের সাহায্য প্রার্থনা।

২। ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শব্দ বিন্যাসে ব্যাকরণ দুষ্টতা বা চ্যুতসংস্কৃতি দোষ হয়। যথা;—তাঁহার সৌজন্যতা ও দাক্ষিণ্যতা দর্শনে পরম সন্তোষ হইলাম।

৩। অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগে অপ্রযুক্ততা দোষ হয়। যথা;—দেবতাসমূহের পূজ্য শিবের চরণ এই অর্থে গীর্ব্বাণস ঘাত ঈড্য কপর্দীর অংঘ্রি।

৪। একার্থ বোধে সমর্থ শব্দের অপরার্থে প্রয়োগ করলে অসমর্থতা দোষ হয়। যথা,—বিরাটতনয় কর দান। বিরাটতনয উত্তর প্রত্যুত্তর বাচক নহে।

৫। অনাবশ্যক পদ প্রয়োগে নিরর্থকতা দোষ হয়। যথা,—আমোদ প্রমোদে রত সদা লক্ষণ।

৬। লজ্জাজনক বর্ণনায় অশ্লীলতা দোষ হয়।

৭। দীর্ঘ সমাস সংকুল পদে অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত হইলে ক্লিষ্টতা দোষ হয়। যথা;—কমলজ সুতাসুত বিষ্ণুক্রয়। ক্ষীরোদতনয়া-পতি-বাহন।

৮। এক শব্দের বারবার ব্যবহারে অনবীকৃততা দোষ হয়। যথা;—করিয়া গমন, করিয়া রন্ধন, করিয়া ভোজন, শয়ন করে।

৯। কবিপ্রসিদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধ বর্ণন হইলে প্রসিদ্ধি-ত্যাগ দোষ হয়। যথা;—পাপরূপ আলোকেতে কুপথ

দেখায়। চন্দ্রোদয়ে সরসীতলে কমলিনী হাস্যমুখী হইলেন।

১০। যে শব্দে যত দূর অর্থ বুঝায় না, সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে অবাচকতা দোষ হয়। যথা;—জ্ঞানান্ধ যাহারা, তাহারা বড় কষ্ট পায়। জ্ঞানান্ধ পদ অজ্ঞ অর্থের বাচক নহে।

১১। আবশ্যক পদের অভাব হইলে ন্যূনপদতা দোষ হয়। যথা;—কেন মন মায়া (জালে) বদ্ধ হয়ে থাক আর।

১২। অনাবশ্যক পদ থাকিলেই অধিকপদতা দোষ হয়। যথা;—বদনে দশনগুলি মুকুতার পাতি। বদন অনাবশ্যক শব্দ।

১৩। অযথাক্রমে বিন্যস্ত হইলে ভগ্নক্রমতা দোষ হয়। যথা;—লক্ষ বা সহস্র বা শত যোদ্ধার কর্ম্ম নহে।

১৪। অর্থাগমে সন্দেহ হইলে সন্দিগ্ধতা দোষ হয়। যথা;—নাদিল কুঞ্জরদল তুরঙ্গ নাদিল।

১৫। ইতর জনোচিত ভাবের প্রয়োগ বা নীচ ভাষার রচনা হইলে গ্রাম্যতা দোষ হয়; যথা,—মোর মেয়ে হয়ে বৈসভাঙ্গড়ের সাতে।

১৬। উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধানানন্তর তাহার অন্যথা হইলে ব্যাহতত্ব দোষ হয়। যথা;—মুখ সুধাকর হইতে কালকূট ক্ষরিত হইতেছে।

১৭। দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অযোগ্য পদ বিন্যাস করিলে অনৌচিত্য দোষ হয়। যথা;—রণযজ্ঞে হত যত বীর পশুগণ। মেঘনাদ কহিলেন, ভীম আমার কাছে কোন্ ছার।

১৮। এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিন্যাস

হইলে ভিন্ন সহচরত্ব দোষ হয়। যথা,—মনোহর লতা গুল্ম মৃগ শাল তাল। গো মেষ মহিষ তরু তরক্ষু বিশাল॥

১৯। এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইলে পুনরুক্তি দোষ হয়। যথা;—তাঁহার মহিমা বর্ণনাতীত, তদীয় মহত্ত্ব বর্ণনা করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

২০। বর্ণনীয় রসের বিপরীত রসভাবের আবির্ভাবে বিরুদ্ধরসভাব দোষ হয়। যথা,—হা প্রিয়ে জানকি! হা রামময়জীবিতে! তুমি কোথায় গেলে?—কি! এত দূর স্পর্দ্ধা! লক্ষ্মণ! ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর, আমি এখনই পৃথিবীকে জানকী হরণের প্রতিফল প্রদান করিতেছি।

২১। অলঙ্কার ব্যতিক্রমে অলঙ্কার দোষ হয়। যথা, অঙ্গে বিভূতি, গলদেশে হাড়মালা, দেখিলে বোধ হয় যেন নীল মেঘে সৌদামিনী শোভিত হইয়াছে।

২২। পরস্পর আকাঙ্ক্ষা যুক্ত পদদ্বয় বহু ব্যবধানে বিন্যস্ত হইলে দূরান্বয় দোষ হয়। যথা,—"গগনে উঠিল, মেঘ বর্ষিল সলিল, শীতল হইল পৃথ্বী মনোহর নীল।"

২৩। ছন্দঃপতনে ছন্দোভঙ্গ দোষ হয়। যথা,—হইয়া পরিতপ্ত পান্থ নিদাঘের কালে। ক্লান্ত শরীরে বসিলেন তরুমূলে।

২৪। প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী পদ বিন্যাসে অপুষ্টার্থতা দোষ হয়। যথা,—শমুশীল জনেরা নশ্বর জগতে যাবজ্জীবন সুখ ভোগ করে।

২৫। অনেকার্থ শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ হইলে নিহতার্থতা দোষ হয়। যথা; হরি সেবি হরিপুরে কে করে গমন। হরি শব্দে যম এটী নিহতার্থ।

২৬। যে রসে যে বর্ণ উপযোগী, তাহার বিপরীত হইলে প্রতিকূলবর্ণতা দোষ হয়। যথা; পাঠক মাঠেতে তুমি মনেরে পাঠাও, অসমা সুষমা হেরি যদি তৃপ্তি চাও।

বিশেষ নিয়ম।

কাব্যের দোষ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ কোন কোন স্থলে দোষও গুণ হইয়া পড়ে। কবিপ্রসিদ্ধিগুলি অবগত না থাকিলে দোষকে গুণ এবং গুণকে দোষ বলিয়া হঠাৎ প্রতীয়মান হইতে পারে, এই জন্য নিম্নে দোষসম্বন্ধে কয়টী উপদেশ সন্নিহিত হইল।

ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রসে শ্রুতিকটু দোষ গুণ হয়। প্রহেলিকা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন স্থলে ক্লিষ্টতা দোষাবহ নহে। নীচলোকের ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ নহে। হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দীনতা, অনুনয়, অনুকম্পা প্রভৃতি স্থলে পুনরুক্তি দোষাবহ হয় না।

পাপে মলিনতা, যশে শুভ্রতা, কন্দর্পের কুসুমধনুঃ, ভ্রমর শিঞ্জিনী ও পঞ্চবাণ, কটাক্ষশর, সূর্য্যোদয়ে পদ্মবিকাশ কুমুদ নিমীলন, চন্দ্রোদয়ে কুমুদ বিকাশ ও পদ্ম নিমীলন, সূর্য্যপ্রিয়া পদ্মিনী ও ছায়া, চন্দ্রপ্রিয়া কুমুদিনী, তারা ও রজনী, মেঘ গর্জ্জনে ময়ূরের নৃত্য ইত্যাদি কতকগুলি কবিপ্রসিদ্ধি; এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ।

ছন্দঃপ্রকরণ।

পদ্যে অক্ষরের কি মাত্রার কোন নিয়মিত পরিমাণকে ছন্দঃ কহে। ছন্দের অসৌষ্ঠবে কবিতা মনোহারিণী হয়

না। ছন্দে গ্রথিত বর্ণ সমূহকে পদ বা চরণ বলে। ঐ রূপ চারি চরণে এক একটী শ্লোক বা কবিতা হয়। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতা সকল দ্বিপদী, চৌপদী ও বহুপদীও হইয়া থাকে।

ছন্দ দুই প্রকার, অক্ষরাবৃত্তি ও মাত্রাবৃত্তি। ছন্দে অক্ষরের সমসংখ্যা থাকিলে অক্ষরাবৃত্তি হয়। যথা,—

একদা নিদাঘ কালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।

মাত্রার সম সংখ্যা থাকিলে মাত্রাবৃত্তি হয়। যথা;—

"পীতাম্বর বর সুরধুনীমস্তে,
স্থাণো ত্রিনয়ন দেব নমস্তে।"

এখানে প্রথম চরণে দ্বাদশ ও দ্বিতীয় চরণে একাদশ বর্ণ থাকিলেও প্রতি চরণে ষোড়শমাত্রা আছে বলিয়া ইহা মাত্রাবৃত্তি।

অক্ষরাবৃত্তি দুই প্রকার; সমবৃত্ত ও বিসমবৃত্ত। সকল চরণে সমান অক্ষর থাকিলে সমবৃত্ত, এবং অক্ষরের ন্যূনাধিক্য হইলে বিষমবৃত্ত হয়। যথা,—

সম;—"প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি পদ্ম বিকসিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।"

বিষম;—"শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়,
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়।"

মিত্রাক্ষর। বাঙ্গলা কবিতায় চরণের শেষ বর্ণের যে মিল থাকে, তাহাকে মিত্রাক্ষর কহে। মিত্রাক্ষর মিলাইবার সময়ে এক চরণের শেষ বর্ণ ও তাহার পূর্ব্বস্বর যে ভাবে থাকিবে, অন্য চরণেরও শেষ বর্ণ ও তৎপূর্ব্ব স্বর ঠিক তদ-

বন্ধ করিতে হইবে। তাহার অন্যথায় সুন্দর কবিতা হয় না। উদাহরণ যথা ;—

করুণা-আকর মাতা দয়া হৈল চিতে,
কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে।

অন্যথা—তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চাহিলাম জল,
তাড়াতাড়ি আনি দিল আধ খানি বেল।

বঙ্গভাষায় পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি সচরাচর প্রচলিত ছন্দে প্রায়ই আট অক্ষর ও ছয় অক্ষর বিশিষ্ট পদ অধিক লাগে। ঐরূপ পদ প্রস্তুত করিবার সহজ নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

অষ্টাক্ষর পদ,—নিরমল নীরময়ী = ৪ + ৪ = ৮। বিধুর উজ্জ্বল আভ = ৩ + ৩ + ২ = ৮। আম জাম নারিকেল = ২ + ২ + ৪ = ৮। কহিলাম মনে মনে = ৪ + ২ + ২ = ৮। মন্দ মন্দ বায়ু বহে = ২ + ২ + ২ + ২ = ৮। যেন নিরমল স্বচ্ছ = ২ + ৪ + ২ = ৮।

ষড়ক্ষর পদ,—সহ কুতূহলে = ২ + ৪ = ৬। নয়ন-রঞ্জন = ৩ + ৩ = ৬। সুখে নিদ্রা যায় = ২ + ২ + ২ = ৬। সমীরণ ভরে = ৪ + ২ = ৬।

যতি। আবৃত্তিকালের বিশ্রাম স্থানকে যতি বলে। প্রত্যেক চরণে এত অক্ষরের পর যতি পড়িবে এমন কোন নিয়ম নাই। অর্থ ও উচ্চারণের সুশ্রাব্যতার প্রতি মনোযোগ রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা বিরাম করিতে পারা যায়। সচরাচর পয়ারে অষ্টাক্ষর পদের পর যতি পড়িয়া থাকে।

পয়ার। ৭ম বা ৮ম অক্ষরে যতি থাকে, প্রতিচরণে এরূপ চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকিলে পয়ার হয়। যথা :—

"একদা নিদাঘ কালে নিশীথ সময়।
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।"

পয়ারে সচরাচর অষ্টাক্ষর ও ষড়ক্ষর পদ ব্যবহৃত হয়। কোন কোন কবি পয়ারের আদি বা অন্তে অধিক অক্ষর যোগ করিয়া থাকেন, ঐরূপ পয়ারকে অধিকাক্ষর পয়ার বলে। যথা,—

"দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার;
বসিয়া ঘেরিল তাঁরে তারাকার এমার কুমার।" ১
"সাধ্য কার সমরে আমার করে অপমান হে,
তব প্রসাদাৎ আমি সবে ভাবি কীটের সমান হে।" ২

পয়ারের শেষে মিত্রাক্ষর মিলিত একটী অধিক অক্ষর থাকিলে মালতীচ্ছন্দঃ হয়। প্রায় লো, গো, হে ইত্যাদি অক্ষরই অধিক থাকে। যথা,—

"কেন না শুনেছি পুরাতন লোকে কয় লো,
জলেতে কাটয়ে জল, বিষে বিষক্ষয় লো।"

মালতীচ্ছন্দকে কেহবা নারীচ্ছন্দ, কেহবা ফুলকু-চ্ছন্দ কহেন।

পয়ারের শেষে অন্য প্রকারের এক অক্ষর বৃদ্ধি হইলে, বৃদ্ধিল পয়ার হয়। যথা,—

"পরের পাইলে দোষ কোন মতে ছাড় না,
আপন কুনীতি প্রতি নাই মাত্র তাড়না।"

প্রথম চরণের প্রথম পদে আট অক্ষর, এবং তাহার পুনরাবৃত্তি, ও শেষ চরণ পয়ার হইলে ভঙ্গ পয়ার হয়। যথা:

"কহ সত্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয়,
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়।"

প্রথম চরণে আট অক্ষর এবং দ্বিতীয় চরণ সাধারণ পয়ার হইলে হীনপদ পয়ার হয়। যথা;—

"শুন অনঙ্গমঞ্জরী। বিনয়ে কহিছে কামিনীর করে ধরি।"

মালতীচ্ছন্দ পয়ারের শেষ ভাগের দ্বিরাবৃত্তি হইলে বিশেষ পয়ার বলে বলে। যথা;—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।"

যে পয়ারের চতুর্থ অক্ষর অষ্টম অক্ষরের সহিত মিলে তাহার নাম তরল পয়ার। যথা;—

"সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধরের তুল,
খগরাজ, পায় লাজ, নাসিকা অতুল।"

মিত্রাক্ষরে মিলিত প্রথম তিনটী চতুরক্ষর পদ এবং শেষে একটী দ্ব্যক্ষর পদ এমন পয়ার হইলে তাহাকে মাল-ঝাঁপ ছন্দ কহে। যথা;—

"স্থলে স্থলে, মণি জ্বলে, দেখি বলে, ভাল।
চল ভাই, চল যাই, দেখা পাই, কাল।"

প্রথমে দুই অক্ষর অধিক একটা পয়ার হইলে কুসুম-মালিকা ছন্দ কহে। যথা;—

"দেখে সুচারু শোভিত সর্বসিদ্ধ সরোবর,
সদা শোভিছে সোপান সারি সারি থরে থর।"

প্রথম দুইটী মিত্রাক্ষর মিলিত চতুরক্ষর পদ, এবং একটী গুরু একটী লঘু এরূপ পঞ্চদশ অক্ষরে এক এক চরণ হইলে তুণক ছন্দ হয়। যথা;—

"ঊর্দ্ধ বাহু, যেন রাহু, চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে,
লম্ফ ঝম্ফ, ভূমি কম্প, নাগ কূর্ম্ম ছাড়িছে।"